وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আশূরার ছিয়াম (মুহাররম মাসের ৯ ও ১০ তারিখ) সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, এর মাধ্যমে তিনি পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন'

(তিরমিযী, হা/৭৫২, আবূ দাউদ, হা/২৪২৫)।

● ৫ম বর্ষ ● ১০ম সংখ্যা ● আগস্ট ২০২১

Web : www.al-itisam.com

সূচিপত্র

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.

السنة: ٥، ذو الحجة و محرم ١٤٤٣-٤٣ هـ/ أغسطس ٢٠٢١م العدد: ١٠، الجزء: ٥٨

تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش

رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف

التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM

Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**

Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**

Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.

Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi; Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203

Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

কর্নিশ মসজিদ, জেদ্দা, সৌদি আরব : এর শক্তিশালী সিলুয়েট, জেদ্দার কর্নিশে লোহিত সাগরের মুখোমুখি বরাবর তিনটি মণ্ডপের সেটখানি ইসলামের উপস্থিতি ঘোষণা করে। মিশরীয় নির্মাণ শৈলিতে পুরো কাঠামোটি গম্বুজ অভ্যন্তর ব্যতিরেকে প্লাস্টারের প্রলেপ সমেত অনাবৃত ইট দ্বারা তৈরি এবং অবয়ব ব্রোঞ্জ রঙে অঙ্কিত। এখানে প্রবেশপথ বারান্দাটি কাটেনারি ভল্ট দ্বারা আবৃত এবং একটি অষ্টভুজ আকৃতির খাদযুক্ত বর্গক্ষেত্রের মিনার রয়েছে।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪২ || ঈসায়ী ২০২১ || বঙ্গীয় ১৪২৮

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ আগস্ট	২১ যুলহিজ্জাহ	রবি	০৪:০৫	০৫:২৭	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:০৪
০৫ ,,	২৫ ,,	বৃহস্পতিবার	০৪:০৮	০৫:২৯	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:০১
১০ ,,	০১ মুহাররম	মঙ্গল	০৪:১১	০৫:৩১	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৬	০৭:৫৬
১৫ ,,	০৬ ,,	রবি	০৪:১৪	০৫:৩৩	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩২	০৭:৫২
২০ ,,	১১ ,,	শুক্র	০৪:১৭	০৫:৩৫	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৮	০৭:৪৭
২৫ ,,	১৬ ,,	বুধ	০৪:২০	০৫:৩৭	১২:০০	০৩:২৮	০৬:২৪	০৭:৪১

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+১	০	-১
নারায়ণগঞ্জ	+১	০	-১
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	+৩	-২	-১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২
রাজবাড়ী	+৪	+৪	+৩
মুন্সিগঞ্জ	+১	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+৫	+২	+১
মাদারীপুর	+৩	+৪	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	+২	+২	-১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-১	+১
শেরপুর	-১	০	+৪
জামালপুর	-১	০	+৪
নেত্রকোনা	-৪	-২	০

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-২	-৩	-৮
কক্সবাজার	+৬	+৭	+৮
খাগড়াছড়ি	-৪	-৫	-৭
রাঙ্গামাটি	-৪	-৫	-৯
বান্দরবান	-৩	-৪	-১০
কুমিল্লা	-২	-২	-৪
নোয়াখালী	০	-১	-৫
লক্ষীপুর	-২	-৩	-৪
চাঁদপুর	-১	০	-২
ফেনী	-২	-২	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৮	-৭	-৪
সুনামগঞ্জ	-৭	-৬	-২
মৌলভীবাজার	-৭	-৬	-৪
হবিগঞ্জ	-৫	-৪	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৭	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+১০
নাটোর	+৫	+৫	+৭
পাবনা	+৫	+৫	+৭
সিরাজগঞ্জ	+২	+২	+৪
বগুড়া	+২	+৩	+৬
নওগাঁ	+৪	+৫	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৪	+৮

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	০	+২	+৮
দিনাজপুর	+৩	+৪	+১০
গাইবান্ধা	০	+১	+৬
কুড়িগ্রাম	-২	০	+৭
লালমনিরহাট	-১	+১	+৮
নীলফামারী	+১	+৩	+১০
পঞ্চগড়	+১	+৩	+১২
ঠাকুরগাঁও	+২	+৪	+১২

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৬	+৬	+২
বাগেরহাট	+৬	+৫	+১
সাতক্ষীরা	+৮	+৮	+৩
যশোর	+৭	+৬	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৭	+৪
ঝিনাইদহ	+৬	+৬	+৪
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৮	+৭	+৭
মাগুরা	+৫	+৫	+৩
নড়াইল	+৬	+৫	+২

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৩	+৩	-১
পটুয়াখালী	+৪	+৩	-১
পিরোজপুর	+৫	-৪	০
ঝালকাঠি	+৪	+৩	-১
ভোলা	+২	+১	-৩
বরগুনা	+৬	+৪	-২

৫ম বর্ষ
১০ম সংখ্যা
আগস্ট-২০২১
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৮
যুলহিজ্জাহ-মুহাররম
১৪৪২-৪৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- প্রধান সম্পাদক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী; তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১
- ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (বিকাল ৪:৩০মি.-৬:৩০মি.)
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী : ০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫
- জামি'আহর উভয় শাখার জন্য : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
  বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
  বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দারসে হাদীছ
  - » কল্যাণকামিতাই দ্বীন ০৪
    -মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল
- প্রবন্ধ
  - » হজ্জ ও উমরা (পর্ব-১২) ০৮
    -আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
  - » ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা বনাম হানাফীদের আক্বীদা (পর্ব-২১) ১০
    -আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
  - » লোক দেখানো আমলের পরিণতি (পর্ব-২) ১৩
    -ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
  - » রক্তাক্ত ফিলিস্তীনের অতীত ও বর্তমান ১৫
    -ড. মো. কামরুজ্জামান
  - » আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব (পর্ব-৭) ১৮
    -মূল : (উর্দূ) : আবু যায়েদ যামীর
    অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান
  - » হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে গরু ও প্রাণীর মাংস খাওয়ার বিধান (পর্ব-২) ২০
    -ব্রাদার রাহুল হোসেন (রুহুল আমিন)
  - » বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি ২২
    -সাঈদুর রহমান
  - » আশূরার ছিয়াম ২৫
    -মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন
- হারামাইনের মিম্বার থেকে
  - » সময় ও ঋতু পরিবর্তনের মূল রহস্য ২৮
    -অনুবাদ : মুরসালীন বিন আব্দুর রউফ
- তরুণ প্রতিভা
  - » শারঈ বিষয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও সালাফে ছালেহীন যেমন ছিলেন ৩১
    -তাওহীদুল রহমান ইবনু মঈনুল হক্ব
- সাময়িক প্রসঙ্গ
  - » আফগানিস্তান, তালেবান ও খোরাসান : বর্তমান প্রেক্ষাপট ৩৩
    -আবু মুহাম্মাদ
- দিশারী
  - » ছালাত : ঝামেলা নয়; আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ৩৮
    -জাবির হোসেন
- শিক্ষার্থীদের পাতা
  - » রাবী পরিচিতি-৬ : আবূ বকর ইবনু আবী মারইয়াম রহিমাহুল্লাহ ৪০
    -আল-ইতিছাম ডেস্ক
- কবিতা ৪১
- বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ৪২
- সওয়াল-জওয়াব ৪৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

নব্য খারেজী থেকে সাবধান!

রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বকর, উমার ও উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর সময়ে কোনো বিভক্তি তৈরি হয়নি। উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ফেতনা শুরু হয়, সংঘটিত হয় উষ্ট্রের ও ছিফফীনের যুদ্ধ। সৃষ্টি হয় এই উম্মাহর মধ্যে প্রথম বিভক্তি। ঐ ফেতনার জের ধরেই জন্ম হয় খারেজী ও শীআ ফেরক্বাদ্বয়ের। এগুলো ৩৭ হিজরী ও তৎপরবর্তী ঘটনা। সুতরাং বলা চলে, খারেজীরাই ইসলামের প্রথম পদস্খলিত ও ভ্রান্ত ফেরক্বা।

'খারেজী' শব্দটি আরবী 'খুরূজ' (خروج) শব্দ হতে নির্গত। এর অর্থ- বেরিয়ে যাওয়া। বহুবচনে 'খাওয়ারিজ' (خوارج) ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থে- যে ব্যক্তি কোনো পূর্বসূরী ছাড়াই নিজে নিজে বেরিয়ে যায়, তাকে খারেজী বলে। এ অর্থ ও খারেজীদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মিল হচ্ছে, তারাও নিজে নিজেই মুসলিমদের অনুসৃত পথ থেকে বেরিয়ে গেছে এবং সালাফে ছালেহীনের মধ্য থেকে তাদের কোনো পূর্বসূরী নেই। পারিভাষিক অর্থে- যারা কাবীরা গোনাহর কারণে কোনো মুসলিমকে কাফের ফতওয়া দেয় এবং মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদেরকে খারেজী বলা হয়। এই দু'টি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে-ই খারেজী। কাফের ফতওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা কখনও কাবীরা গোনাহগারকে কাফের বলে। আবার কখনও পাপই নয়- এমন ব্যাপারে কাফের বলে। কখনও আবার স্রেফ ধারণার বশবর্তী হয়ে কাফের বলে। কখনও দেখা যায়, ইজতিহাদী বিষয়ে কাফের বলে। এসব ক্ষেত্রে তারা কোনো ধরনের নিয়মনীতি ও শর্তের তোয়াক্কা করে না। তবে, আক্বীদা, আমল ও চরমপন্থার দিক দিয়ে খারেজীরা সবাই এক রকম নয়। যাদের মধ্যে খারেজীদের নিদর্শন পাওয়া যায়, তারা দুই শ্রেণির: এক শ্রেণির মধ্যে খারেজীদের সবকিছুই পাওয়া যায় এবং আসলেই তারা খারেজী। এদের ব্যাপারে হাদীছে কঠোর শাস্তি ও নিন্দার কথা এসেছে। আরেক শ্রেণির মধ্যে খারেজীদের কিছু আলামত পাওয়া যায়, কিন্তু তাদেরকে খারেজী বলা যায় না। এ প্রকারটি বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের মধ্যে পাওয়া যায়, যাদের আলামতগুলোকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করতে না পারলে তারাও প্রথম শ্রেণিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ফলে এদের অবস্থাও অত্যন্ত বিপজ্জনক।

কিছু কারণ রয়েছে, যেগুলো একজন মানুষকে ধীরে ধীরে খারেজী হওয়ার বা চরমপন্থা অবলম্বনের দিকে নিয়ে যায়। যেমন- (ক) দ্বীনী ইলমের চরম সংকট। (খ) সালাফী মানহাজের প্রতি অবজ্ঞা। (গ) দ্বীন পালনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি। (ঘ) জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছাড়াই অযথা আবেগপ্রবণতা। (ঙ) আলেম-উলামার সাহচর্য থেকে দূরে অবস্থান ও তাদের কাছ থেকে ইলমগ্রহণ বর্জন। (চ) জ্ঞানীর ভাব ধরা ও আত্ম-অহংকারে ফেটে পড়া। (ছ) বয়সের স্বল্পতা ও অপ্রতুল অভিজ্ঞতা। (জ) আল্লাহর দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈর্য ও প্রজ্ঞার অভাব ইত্যাদি।

প্রাচীন ও নব্য প্রত্যেক খারেজী আসলে একই গোয়ালের গরু। সর্বযুগে তাদের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ প্রায় একই। তবে কিছু বৈশিষ্ট্য এমন আছে, যা প্রাচীন খারেজীদের মধ্যে ছিলো, কিন্তু এখন নেই। আবার এর উল্টোটাও ঠিক। আবার কিছু বৈশিষ্ট্য আগে ছিলো, এখনও আছে; তবে মাত্রা বহুগুণে বেড়ে গেছে। প্রত্যেক খারেজীর মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কাবীরা গোনাহগারকে কাফের বলা। মূলত এই বিশ্বাস থেকেই এদের অন্য শাখা-উপশাখা বৈশিষ্ট্যগুলো গজিয়েছে। এখান থেকেই তারা মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কারণ তাদের দৃষ্টিতে তারা কাফের। ফলে ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের নামে তারা মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রোপাগান্ডা চালায়। এতে তারা নিজেদের সাহসী বীরপুরুষ ভাবে। এছাড়া তাদের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: (১) সর্বযুগের খারেজীরা মূল যে ভিত্তির উপর ভর করে মুসলিমদেরকে কাফের বানানোর অপচেষ্টায় নামে, সেটা হলো- 'আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ফায়সালা করা'। এই হক্ব কথার অন্তরালে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকে। (২) কুরআন-হাদীছ বুঝার ক্ষেত্রে সালাফে ছালেহীনের বুঝের তোয়াক্কা না করা। কারণ সালাফে ছালেহীনকে তারা পাঁচ পয়সার মূল্য না দিয়ে নিজেদেরকে মহাপণ্ডিত মনে করে এবং যা ইচ্ছা ব্যাখ্যা প্রদান করে। (৩) তাদের মধ্যে আলেম-উলামা না থাকা। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর বর্ণনামতে, তৎকালীন খারেজীদের মধ্যে একজনও ছাহাবী ছিলেন না। তার মানে তাদের মাঝে একজন আলেমও ছিলেন না। কারণ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সময়ে ছাহাবীগণ কেবল আলেম ছিলেন। বর্তমানযুগে তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়।

www.al-itisam.com

(৪) বিরোধীদের প্রতি চরম দুঃসাহসিকতা, তিনি যত জ্ঞানী-গুণী-সম্মানীই হন না কেন। (৫) তাদের বিরোধী আলেম-উলামাকে জাতির সামনে খাঁটো করে উপস্থাপন করা এবং হীন ও রূঢ় আচার-ব্যবহার দেখানো। তারা আলেম-উলামাকে কাপুরুষতা ও ভয়ের অপবাদ দিয়ে থাকে। বর্তমানযুগে তারা আলেম-উলামাকে 'মুরজিঈ', দরবারী আলেম, সরকারের দালাল ইত্যাদি ট্যাগ লাগিয়ে জাতির সামনে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। যাদের প্রথম পূর্বপুরুষ যুল খুওয়াইছারা স্বয়ং রাসূল ﷺ-কে বেইনছাফীর ট্যাগ লাগানোর দুঃসাহস দেখিয়েছিল (!), তার বশংবদেরা অন্য যে কাউকে যে কোনো ট্যাগ লাগাতে পারে- এটাই স্বাভাবিক নয় কি? (৬) যাকে তাকে কাফের ফতওয়া দেওয়া, বিশেষ করে শাসকশ্রেণিকে। তাদের কাছে বর্তমান মুসলিম শাসক বলতে কেউ নেই। এক্ষেত্রে তাদের জিহ্বা অত্যন্ত পিচ্ছিল। এমনকি পিতা-মাতা পর্যন্ত তাদের এই ফতওয়াবাজি থেকে বাঁচতে পারেন না। (৭) তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিমদেশ বলে কিছুই নেই, এমনকি মক্কা-মদীনাও না। (৮) মুসলিমদের রক্তপিপাসা। অযথা মুসলিমদের কাফের ফতওয়া দিয়ে তাদের রক্ত নিয়ে হোলিখেলা খারেজীদের সর্বযুগের বৈশিষ্ট্য। এমনকি তাদের বিরোধীদের স্ত্রী-সন্তানরাও তাদের নগ্ন হামলা থেকে বাদ যায় না। মুসলিমবিশ্বের আত্মঘাতি ও গুপ্ত হামলাগুলো তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। (৯) যিম্মী, মুস্তা'মিন ও মু'আহাদ কাফেরের রক্ত হালাল মনে করা। আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশে আগমনকারী কাফেরদের উপর বিভিন্ন সময়ে নগ্ন হামলা একথার প্রমাণ বহন করে। (১০) কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের কখনও কোনো ভূমিকা ছিলো না, আজও নেই; বরং তাদের সংগ্রামই হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে। (১১) হিজরতের আহ্বান জানানো, এমনকি মক্কা-মদীনা থেকেও। তারা লোকালয় বর্জন করে নির্জনে যাওয়ার ডাক দেয়। সেজন্য বোধ হয়, অনেককে গ্রামে-গঞ্জে, বনে-জঙ্গলে হিজরতের ডাক দিতে দেখা যায়। (১২) নিজেদেরকে ফিরক্বা নাজিয়াহ বলে বিশ্বাস করা এবং তারা ভিন্ন আর কেউ কুরআন ও সুন্নাহর উপরে নেই মনে করা। (১৩) এদের দৃঢ় ও পূর্ণ বিশ্বাস হলো, তাদের অনুসারীরা শহীদ ও জান্নাতে। (১৪) মানুষকে বাতিলে অবগাহন করাতে কিছু হকের টোপ দেওয়া এবং সাথে বাতিল মিশিয়ে গলধঃকরণ করানো। (১৫) কারো ব্যাপারে তড়িঘড়ি করে হুকুম দেওয়া। (১৬) চটকদার কথা কিন্তু গর্হিত কাজ। (১৭) প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া। তাদের কর্মকাণ্ডে সবসময় এটা প্রমাণিত। (১৮) সবকিছুতে গোপনীয়তা। সেজন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এদের কণ্ঠ শোনা যায়, কিন্তু চেহারা দেখা যায় না। (১৯) নিজেদের ভুল স্বীকার না করা; বরং উল্টো নিজেদের কর্মকাণ্ডকে নেকীর কাজ ভাবা। সেজন্যই তো তাদেরকে নিরীহ মানুষ জবাইয়ের ভিডিও প্রচার করে উল্লাস করার ভিডিও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যায়। (২০) খারাপ নয় এমন কিছুকে খারাপ হিসেবে উপস্থাপন করা। (২১) মুসলিম শাসকের নেতৃত্বে জিহাদকে অস্বীকার করা এবং যত্রতত্র জিহাদের ডাক দেওয়া। (২২) ইসলামের কল্যাণ-অকল্যাণের মূলনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো। সেজন্য হিতাহিত জ্ঞানহীনভাবে তাদেরকে বিভিন্ন অপকর্ম ঘটাতে দেখা যায়।

বুঝা গেলো, চরমপন্থা ও উগ্রবাদই খারেজীদের মূল হাতিয়ার; এরা অসম্ভব রকমের চরমপন্থী ও উগ্রবাদী হয়ে থাকে। এদের এই সীমালঙ্ঘন ও চরমপন্থার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এদেরকে নানানভাবে নিন্দা করেছেন এবং এদের কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি তাদেরকে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন *(মুসলিম, হা/১০৬৭)*। তাদেরকে জাহান্নামের কুকুর বলা হয়েছে *(ইবনু মাজাহ, হা/১৭৬, হাসান)*। তারা ইসলাম থেকে তীরের ধনুক থেকে বের হওয়ার ন্যায় বের হয়ে যায় *(বুখারী, হা/৩৬১১; মুসলিম, হা/১০৬৪)*। রাসূল ﷺ এদেরকে হত্যা করতে বলেছেন এবং হত্যাকর্মে নেকীর ঘোষণা দিয়েছেন *(বুখারী, হা/৬৯৩০; মুসলিম, হা/১০৬৬)*। বরং তিনি নিজে তাদেরকে আদজাতির মতো করে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছেন *(বুখারী, হা/৩৩৪৪; মুসলিম, হা/১০৬৪)*।

কারণ এদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমরা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। এরা বিভিন্ন সময় পৃথিবীব্যাপী নিষ্পাপ ছোট-বড়, নারী-পুরুষের রক্ত ঝরিয়েছে। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি করেছে। মুসলিমদের মান-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। কাফেরদের চোখে ইসলাম ও মুসলিমদের খাঁটো করেছে। এরাই মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ইসলাম ও এর অনুসারীদেরকে সন্ত্রাসী ট্যাগ লাগিয়ে বিশ্বদরবারে উপস্থাপন করেছে। ফলে তারা যেমন প্রত্যক্ষভাবে মুসলিমদের উপর নগ্ন হামলা চালিয়েছে, তেমনি কাফেরগোষ্ঠীকে দিয়েও তাদের জান-মালের উপর আক্রমণের পথ তৈরি করে দিয়েছে। তাদেরকে বহু বছর পিছিয়ে দিয়েছে।

মহান আল্লাহ খারেজীসহ সকল দিকভ্রান্তদের হেদায়াত দান করুন এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের হেদায়াতের উপর অবিচল রাখুন। আমীন!

কল্যাণকামিতাই দ্বীন

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا لِمَنْ قَالَ «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».

সরল অনুবাদ : তামীম আদ-দারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আদ-দ্বীন আন-নাছীহা তথা কল্যাণকামিতাই দ্বীন'। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কার জন্য? তিনি বললেন, 'আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের জন্য'।[১]

ব্যাখ্যা :

নছীহা-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানে নছীহাকে আল-খুলূছু (اَلْخُلُوْصُ) বা ভেজালমুক্ত হওয়া থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়- নাছাহাশ শাইয়ু (نَصَحَ الشَّيُّ) এ কথা তখন বলা হয়, যখন কোনো বস্তু ভেজালমুক্ত হয়। এখান থেকেই আন-নাছেহু (اَلنَاصِحُ) তথা কল্যাণকামী এর উদ্ভব হয়েছে। যেমন বলা হয়- নাছাহাল আসালু (نَصَحَ الْعَسَلُ) মধু বিশুদ্ধ হয়েছে, একথা তখন বলা হয়, যখন মধুকে মোম থেকে পবিত্র করা হয়। প্রত্যেক বস্তুই যখন তার অবস্থান বা পরিবেশ অনুযায়ী ময়লা-আবর্জনা বা অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়, তখন বলা হয় খালাছাশ শাইয়ু (خَلَصَ الشَّيُّ) অর্থাৎ নাছাহাশ শাইয়ু (نَصَحَ الشَّيُّ) তথা বস্তুটি নির্ভেজাল বা পরিষ্কার-পরিছন্ন হয়েছে।[২] আবার কেউ কেউ বলেছেন, নছীহা নাছহুন থেকে গৃহীত। দুটি বস্তুর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সংশোধিত হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হওয়া।[৩] কেননা একজন মানুষ যখন আরেকজন মানুষের কল্যাণ কামনা করে, তখন সে তার সাথে মিশে যায় এবং নিজেকে তার আচরণের সাথে খাপ খাওয়ায়ে নেয় এবং সংশোধিত হয়।

ইবনু আছীর রাহিমাহুল্লাহ তাঁর নেহায়া গ্রন্থে বলেছেন, নছীহা হলো এমন একটি শব্দ, যা দিয়ে একটি বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, উপদেশদানকৃত ব্যক্তির সার্বিক কল্যাণ কামনা করা। এটি ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়।[৪]

আবূ সুলায়মান আল-খাত্ত্বাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নছীহা এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যা উপদেশদানকৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর যে কোনো তথ্যকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

আল্লামা রাগেব আল-ইছফাহানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আরবদের কথা, 'আমি তার জন্য আমার ভালোবাসাকে নছীহা তথা নির্জল করেছি' থেকে শব্দটি নেওয়া হয়েছে। অথবা তাদের কথা 'ত্বককে পরিষ্কার করা তথা ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত করা' শব্দটি থেকে নেওয়া হয়েছে।[৫] শরীরের ত্বককে যেভাবে ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে কারও কল্যাণকামিতা এবং তাকে ভালোবাসার জন্য হৃদয়কে কালিমামুক্ত করা।

নছীহা-এর পারিভাষিক অর্থ : আল্লামা রাগেব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নছীহা হলো এমন কাজ অথবা আদেশ পালন, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সার্বিক কল্যাণ আছে। আল্লামা জুরজানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নছীহ হলো এমন সব বিষয়ের প্রতি আহ্বান করা, যার মধ্যে কল্যাণ আছে আর এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা, যার মধ্যে বিপর্যয় আছে।[৬]

হাদীছটির গুরুত্ব : আলোচ্য হাদীছটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাদীছটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রমাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এখানে নছীহা তথা কল্যাণকামিতাকেই দ্বীন বলা হয়েছে। ইসলামের প্রত্যেক বিধিবিধানই নছীহা তথা কল্যাণকর। অর্থাৎ ইসলাম একটি নছীহাভিত্তিক জীবনব্যবস্থা। একটিমাত্র বাক্য 'কল্যাণকামিতাই দ্বীন'। এর মধ্যে ইসলামের সকল বিধিবিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইসলামের এমন কোনো বিধান নেই, যা এর মধ্যে নেই। যেমনভাবে আরাফার ময়দানে অবস্থানকেই হজ্জ বলে বর্ণনা করেছেন। ছালাত, ছিয়াম, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, সালাম দেওয়া ও হাসিমুখে কথা বলা ইত্যাদি সবই নছীহা। ইবনু রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হাদীছে জিবরীলে বর্ণিত ইসলাম, ঈমান ও ইহসানকে হাদীছটি অন্তর্ভুক্ত করে, যেগুলোকে দ্বীন বলে'।[৭] ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ এই হাদীছের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেছেন, এটি হলো ইসলামের ভিত্তি। আর আলেমদের একদল একথা বলেছেন যে, এটি ইসলামের এক-চতুর্থাংশ। অর্থাৎ এটি ইসলামের ঐ চারটি হাদীছের অন্যতম, যেগুলো ইসলামের সকল বিধিবিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু

* প্রভাষক, বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৫, আবূ দাঊদ, হা/৪৯৪৪; নাসাঈ, হা/৪২০৮।
২. লিসানুল আরাব, ২/৬১৫।
৩. সাইদ. নেট, আদ-দ্বীন আন-নাছীহা হাদীছের ব্যাখ্যা।
৪. মুআন-নিহায়া
৫. রাগেব, ৪৯৮।
৬. আল্লামা ইবনু ফারিস এর মু'জামু মাকাইসিল লুগা, ৫/৪৩৫।
৭. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/২১০, মুয়াসসাতুল রিসালা।

www.al-itisam.com

বাস্তবে বিষয়টি এমন নয়। বরং এটি এককভাবে ইসলামের সকল বিধিবিধানের উৎস।[৮]

নছীহা সম্পর্কে আরও কয়েকটি হাদীছ রয়েছে, যেখানে আল্লাহর রাসূল ﷺ নছীহা বা কল্যাণকামিতাকে মুমিনের জীবনের অপরিহার্য বিষয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, একজন মুসলিমের আরেকজন মুসলিমের উপর ছয়টি অধিকার রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, 'যখন তুমি তার (মুমিন ভাই) সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সালাম দিবে। যখন সে তোমাকে আহ্বান করে, তখন তুমি তার আহ্বানে সাড়া দিবে। যখন সে তোমার নিকট নছীহা কামনা করবে, তখন তাকে উপদেশ দিবে। যখন তার হাঁচি আসবে এবং সে আল-হামদুলিল্লাহ , তখন ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে। যখন সে অসুস্থ হবে, তখন তুমি তার সেবা করবে। যখন সে মৃত্যুবরণ করবে, তখন তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে'।[৯]

অর্থাৎ যখন সে কোনো বিষয়ের কল্যাণকর অথবা অকল্যাণকর হওয়া সম্পর্কে যখন কেউ তোমার নিকট নছীহা তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ চায়, তখন তুমি তাকে এমন সিদ্ধান্ত দাও, যা তোমার নিজের জন্য পছন্দ কর। যদি কাজটি কল্যাণকর হয়, তবে তাকে করার জন্য উৎসাহিত করো আর যদি ক্ষতিকর হয়, তবে সতর্ক করো। আর যদি কাজটির কল্যাণকর ও অকল্যাণকর উভয়টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও। কল্যাণকর ও ক্ষতিকর দিকগুলো তুলনা করে দেখাও, যাতে সে ক্ষতি থেকে বেঁচে যায়। যদি কেউ লেনদেন কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ চায়, তবে তুমি তাকে এমন পরামর্শ দাও, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর। তাকে প্রতারণা করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, প্রতারণা করলে তুমি মুসলিম থাকবে না। উল্লিখিত ক্ষেত্রে নছীহা প্রদান করা ওয়াজিব। কিন্তু নছীহার আবেদন করা হলে, নছীহা করা অপরিহার্য। এই কারণেই উক্ত হাদীছে নছীহাকে চাওয়ার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। কারণ, যখন কেউ নছীহা চায়, তখন নছীহা ফরয হয়ে যায়। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলছেন, আমরা ছালাত ক্বায়েম, যাকাত প্রদান এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনার উপর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হাতে বায়আত করলাম।[১০] আল্লামা আইনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ছাহাবীদের থেকে যেসব বিষয়ের বায়আত গ্রহণ করেছেন, তার সাথে নছীহাকে সংযুক্ত করে বুঝিয়েছেন যে, নছীহা ঐরূপ গুরুত্বপূর্ণ যেমন ছালাত ও যাকাত গুরুত্বপূর্ণ।[১১]

হাদীছটির তাৎপর্য : নছীহা শুধু দ্বীনই নয়, বরং প্রত্যেক নবী-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) -এর একমাত্র দায়িত্ব ছিল মানুষকে নছীহার প্রতি আহ্বান করা। স্বীয় জাতিকে আল্লাহ শাস্তির ভয় প্রদর্শন এবং তাঁর ইবাদতের প্রতি আহ্বানের জন্য নবীদেরকে পাঠানো হয়েছে। এক্ষেত্রে নবীদের দৃষ্টান্তের প্রতি নযর দিলে দেখা যায়, নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর সম্প্রদায়কে দাওয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করে বলছেন, 'আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের বাণী প্রচার করছি এবং তোমাদের নছীহা করছি, কিন্তু তোমরা নছীহাকারীদের পছন্দ কর না' *(আল-আ'রাফ, ৭/৭৯)*।

মহানবী ﷺ তার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তিনি তাঁদের পদ্ধতি অনুসারে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব অনুযায়ী তিনি দাওয়াতের ধরন পরিবর্তন বা আধুনিকীকরণ করেছেন, যা তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম বাস্তবায়নে বড় ভূমিকা রেখেছে। জনৈক বেদুঈনের মসজিদে প্রস্রাব করার সময় তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ অবস্থান এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[১২]

আলোচ্য হাদীছে আল্লাহর রাসূল ﷺ নছীহার ক্ষেত্রগুলোর সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এখানে তিনি নছীহাকে আল্লাহ, কিতাব, রাসূল, রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি, আলেম এবং সাধারণ মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

(১) আল্লাহ তাআলার জন্য নছীহা : আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন করা। তাঁকে শিরক থেকে মুক্ত রাখা। তাঁর গুণাবলির ভুল ব্যাখ্যা না করা। পূর্ণতা ও মাহাত্ম্যের সব গুণে তাঁকে গুণান্বিত করা তথা যে কোনো অপূর্ণতা থেকে মুক্ত করা। তাঁর আনুগত্য করা তথা অবাধ্য আচরণ না করা। ভালোবাসা কিংবা শত্রুতা একমাত্র তাঁর জন্যই পোষণ করা। যারা তাঁর আনুগত্য করে, তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ আর যারা তাঁর অবাধ্যাচরণ করে, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা। যারা তাঁকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সকল কর্মকাণ্ড একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সম্পাদন করা। উল্লিখিত গুণাবলির প্রতি মানুষের

৮. আল্লামা নববী, শারহু ছহীহ মুসলিম, ২/৩৭।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/১২৪০; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৬২।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/১২৪০; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৬২।
১১. উমদাতুল ক্বারী, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, ১/৩২৪।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/৬১২৮।

www.al-itisam.com

হৃদয়ে গভীর ভালোবাসা ও উৎসাহ তৈরি করা। দয়া ও অনুগ্রহের সাথে মানুষের প্রতি ভালো ব্যবহার করা। বিশেষ করে তাদের প্রতি যারা সর্বদা আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণে মগ্ন থাকে।[১৩]

সারকথা হলো, জীবনের প্রত্যেক বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার স্মরণে মগ্ন থাকা। জিহ্বাকে আল্লাহর যিকিরে সর্বদা সতেজ রাখা। শারঈ বিধানের আলোকে জীবনযাপন করতে সর্বদা অভ্যস্ত হওয়া। ইসলামবিদ্বেষীদের প্রশ্নের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আল্লাহর পথের আহ্বায়ক করা এবং দ্বীনের খিদমতের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করা।

(২) আল-কুরআনের জন্য নছীহা : আল-কুরআনকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করা। এর মতো শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, রচনাশৈলী, উদ্দেশ্য নির্বাচন ইত্যাদির কোনোটাই মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এমন বিশ্বাস পোষণ করা। একে যথাযথ সম্মান, আন্তরিকতা, বিনয়ের সাথে তেলাওয়াত করা। এর প্রতিটি অক্ষর মাখরাজ ও ছিফাতসহ উচ্চারণ করা। এর অপব্যাখ্যা ও সমালোচনার দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া। এতে বর্ণিত বিধানকে গভীরভাবে বিশ্বাস এবং সেই অনুযায়ী আমল করা। এর জ্ঞান, উপদেশ, শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত অনুধাবন করার চেষ্টা করা। এর অলৌকিক ঘটনা, ব্যাপকতা, বিশেষত্ব, নাসেখ (রহিতকারী) এবং রহিত (মানসূখ) ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণা করা। এর জ্ঞান ও শিক্ষা মানুষের নিকট প্রচার করা।[১৪]

শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন আল-কুরআনের নছীহা হিসেবে নিম্নের বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন।

(ক) বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার কবল থেকে আল-কুরআনকে রক্ষা করা এবং এ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা।

(খ) আল-কুরআনের প্রত্যেক ঘটনাকে বিনাদ্বিধায় ও দৃঢ়চিত্তে সত্য বলে স্বীকার করা। এর একটি তথ্যকে মিথ্যা মনে করলে আল-কুরআনের জন্য নছীহতকারী হওয়া যাবে না। এমনিভাবে এতে সন্দেহ পোষণ কিংবা এর সততার ক্ষেত্রে দ্বিধাবোধ করলে আল-কুরআনের নছীহতকারী হওয়া যাবে না।

(গ) আল-কুরআনের আদেশ অনুযায়ী আমল করা। আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য এতে যে নির্দেশনা এসেছে, তার একটিও যদি কেউ বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকে, তবে তাকে আল-কুরআনের নছীহ বলা যাবে না।

(ঘ) আল-কুরআনে যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকা। যদি কোনো ব্যক্তি এগুলোর একটি থেকে বিরত না থাকে, তবে তাকে নছীহতকারী বলা যাবে না।

(ঙ) আল-কুরআনে যে বিধান রয়েছে, তাকে সর্বোত্তম বিধান হিসেবে বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়া। কেননা পবিত্র কুরআনের বিধান ব্যতীত অন্য কোনো বিধান সর্বোত্তম হতে পারে না।

(চ) আল-কুরআনের প্রত্যেকটি বর্ণ ও এর অর্থ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে বলে বিশ্বাস করা। সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তাআলাই স্বয়ং এই বাণীর প্রচারক। জিবরীল আলাইহিস সালাম এর সকল বাণী সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে গ্রহণ করে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হৃদয়ে অবতীর্ণ করেছেন। যাতে করে তিনি সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় ভয় প্রদর্শনকারী হতে পারেন।[১৫]

সারকথা হলো, আল-কুরআনকে সুন্দর করে সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করা। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 'তুমি সুললিত কণ্ঠে আল-কুরআন তেলাওয়াত করো' *(আল-মুযযাম্মিল, ৭৩/৪)*। এতে যে নিগূঢ় রহস্য রয়েছে, তা নিয়ে গবেষণা করা এবং এর নির্দেশনার আলোকে নিজের জীবন গড়ে তোলা এবং মানুষকে সে অনুযায়ী আমল করার জন্য উৎসাহিত করা।

(৩) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নছীহা : ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নছীহা আল-কুরআনের জন্য নছীহার অনুরূপ। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং তাঁর আনুগত্যের উপর অটল থাকা। তাঁর সুন্নাহকে বিশ্বাস এবং জীবিত করা। তাঁর আদর্শে প্রভাবিত হয়ে সুন্নাহর জ্ঞান প্রচারে অবদান রাখা। যে তাঁর কিংবা তাঁর সুন্নাহর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করা। আর যে তাঁর কিংবা তাঁর সুন্নাহর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা। তাঁর আদর্শের আলোকে জীবন গঠন করা। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। তাঁর পরিবার ও ছাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা।[১৬]

শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন রহিমাহুল্লাহ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য নছীহাকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করেছেন :

(ক) আনুগত্যকে একমাত্র তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা এবং অন্য কারো আনুগত্য না করা। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশা রাখে এবং আল্লাহকে[১৭] অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে' *(আল-আহযাব, ৩৩/২১)*।

---

১৩. আল্লামা নববী, শারহে ছহীহ মুসলিম, ২/৩৮।
১৪. আল্লামা নববী, শারহে ছহীহ মুসলিম, ২/৩৮।
১৫. শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল আরবাঈন আন-নাবাবিয়াহ, পৃ. ১১৬।
১৬. ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/২৩৩।
১৭. শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল আরবাঈন আন-নাবাবিয়াহ, পৃ. ১১৭।

www.al-itisam.com

(খ) তাঁকে সত্যিই আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করা। তিনি কখনোই মিথ্যা বলেননি কিংবা তার পক্ষ থেকে কখনোই মিথ্যা বলা হয়নি এবং তিনি সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবী এই বিশ্বাস করা।

(গ) তিনি যে বাণী নিয়ে এসেছেন তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইত্যাদি যে কালেরই হোক না কেন তা বিশ্বাস করা।

(ঘ) তাঁর আদর্শকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা।

(ঙ) তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা।

(চ) বাতিলপন্থীদের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর শরীআতকে রক্ষা করা।

(ছ) আল্লাহ তাআলা ও রাসূল ﷺ-এর বিধানের মধ্যে কোনো রকম পার্থক্য না করা। অর্থাৎ আমলের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে আল্লাহর বাণীর মতো গুরুত্ব দেওয়া। কেননা সুন্নাহর মাধ্যমেই আল-কুরআনের বিধান বাস্তবায়িত হয়েছে।

(জ) আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে সাহায্য করা। জীবিত থাকলে তাঁকে সঙ্গ দিয়ে কিংবা পাশে থেকে আর মৃত্যুর পর তাঁর সুন্নাহকে সমাজে বাস্তবায়ন করে সহায্য করা।[১৮]

মোদ্দাকথা, তিনি যে অহীর বিধান নিয়ে এসেছেন, তাকে সত্য বলে স্বীকার করা। তাঁর কোনো বিধানের রহস্য অজানা থাকলেও তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা। তাছাড়া প্রকৃত ঈমানের দাবী হচ্ছে, তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এসেছে বলে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস ও স্বীকার করা। তাঁর সুন্নাত ও হেদায়াতকে ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবায়ন করা। আর এটাই তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আনুগত্যের নিদর্শন।

(৪) নেতা/রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি/আলেমের জন্য নছীহা : দ্বীন হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর নেতৃবৃন্দের জন্য নছীহা। এর দ্বারা আলেম সম্প্রদায় এবং যারা দেশের শাসকবর্গ, তাদের সকলকে সমভাবে বোঝানো হয়েছে। কারণ আলেমরা হচ্ছেন দ্বীনের নেতা আর শাসকগোষ্ঠী হচ্ছেন দুনিয়ার নেতা।

আলেমদের জন্য নছীহা হলো তাদেরকে ইলম হাছিলের উৎস মনে করা। তাদের সাহচর্য লাভের উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। তাদের মর্যাদা এবং তাদের নিকটে ইলম অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা, যাতে আলেমদের প্রতি তাদের হৃদয়ে গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আলেমদের ভুল-ভ্রান্তি এবং পদস্খলন গোপন রাখা। এগুলো মানুষের নিকট প্রকাশ করা তাদের প্রতি সবচেয়ে বড় সীমালঙ্ঘন ও শত্রুতা। এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে শ্রেণিভেদ ও বৈষম্য তৈরি হয়। মানুষ যা গোপন করতে চায়, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো মোটেও কাম্য নয়।

শাসকদের জন্য নছীহা হলো সত্যে ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করা। তাদের আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। ভুল বা অনিয়ম হলে বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। প্রজাদের অধিকার এবং দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা। তাদের আনুগত্য করা এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করা। সাধারণ মানুষের হৃদয়ে তাদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা। তাদের পেছনে ছালাত আদায় করা। তাদের পরিচালিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। তাদের নিকট ছাদাক্বার মাল পৌঁছে দেওয়া। মিথ্যা প্রশংসার মাধ্যমে তাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত না করা। তাদের জন্য সংশোধনের জন্য দু'আ করা।[১৯]

(৫) সাধারণ জনগণের কল্যাণ কামনা করা : সাধারণ মানুষের জন্য তাই পছন্দ করা, যা নিজের জন্য পছন্দ করা হয়। তাদেরকে এমন পরামর্শ দেওয়া, যা তাদের জীবিকা প্রশস্ত করে এবং উত্তম চরিত্রের উপর গড়ে তোলে। ভুল পথে চললে ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া। ধৈর্য ও সহনশীলতার পথে চলার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা। তাদের প্রতি এমন আচরণ করা, যাতে তাদের মন গলে যায় এবং তারা দুর্বল হয়ে যায়। এভাবেই মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং তারা যেন একটি শরীরের মতো হয়ে যায়, যার একটি অঙ্গ ব্যথিত বা আহত হলে পুরো শরীর ব্যথা আর অনিদ্রায় রাত্রিযাপন করে।[২০]

উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে আল্লাহর নবী ﷺ আমাদেরকে নছীহা তথা কল্যাণকামিতার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এই হাদীছের শিক্ষা আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত হলে আমাদের মন পবিত্র হবে, পারিবারিক অশান্তি দূর হবে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। অফুরন্ত ভালোবাসা আর অবারিত কল্যাণে আমাদের জীবন ভরে যাবে। সুতরাং আমরা যখনই কোনো আমল বা কোনো কাজ করব, তখন অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নছীহা তথা নির্দেশনা অনুযায়ী করব। আল্লাহ তাআলা সকলকে এই হাদীছের শিক্ষা এবং আদর্শ অনুযায়ী জীবন গড়ার তাওফীক্ব দান করুন। সঠিক ও সত্য পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন!

---

১৮. আল্লামা নববী, শারহে ছহীহ মুসলিম, ২/৩৮।

১৯. ইবনু রজব (রহিমাহুল্লাহ), জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/২৩৩।

www.al-itisam.com

হজ্জ ও উমরা

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(পর্ব-১২)

ইহরাম অবস্থায় যা নিষিদ্ধ :

(১) ইহরাম বাঁধার সময় ইযতেবা (চাদর ডান বগলের নিচে দিয়ে বাম কাঁধে রাখা) করা যাবে না। ইযতেবা হবে শুধু প্রথম ত্বওয়াফের সময়।

(২) মীক্বাতে পৌঁছার পূর্বে ইহরাম বাঁধা যাবে না। তবে কাপড় পরতে পারবে।

(৩) ইহরাম ছাড়া মীক্বাত অতিক্রম করা যাবে না।

তালবিয়া পাঠ : ইহরাম বাঁধার পরেই যে কাজটি সবচেয়ে বেশি করতে হবে, তা হলো তালবিয়া পড়া। বিদায় হজ্জে রাসূল ﷺ-এর পঠিত এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এর বর্ণিত তালবিয়া হলো, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ **উচ্চারণ :** *লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক।* **অর্থ :** 'হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। আপনার ডাকে সাড়া দিতে আমি উপস্থিত। আপনার কোনো শরীক নেই। আমি আপনার ডাকে উপস্থিত। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আপনার। সমস্ত অনুগ্রহ আপনার, রাজত্ব আপনার, কোনো শরীক নেই আপনার'।[১] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূল ﷺ এই তালবিয়াটি পড়তেন। এই হাদীছে মহান আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি রয়েছে। আল্লাহকে সমস্ত বিষয়ে শরীকমুক্ত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। হাদীছটি হতে শিক্ষা নিয়ে প্রতিটি পুরুষ-নারীকে শিরকমুক্ত জীবনযাপন করতে হবে।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّيْ إِلاَّ لَبَّى مِنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا».

সাহল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি তালবিয়া পাঠ করে, তখন তার সাথে সাথে তার ডানে-বামে গাছপালা, পাথর, মাটি, ঢিলা এমনকি পূর্ব-পশ্চিমের সীমান্ত পর্যন্ত মাটিও তালবিয়া পাঠ করে'।[২] এই হাদীছ হতে তালবিয়া পাঠের ফযীলত সম্পর্কে জানা যায়। যখন কোনো ব্যক্তি তালবিয়া পাঠ করে, তখন পৃথিবীর সবকিছুই তালবিয়া পাঠ করে।

عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «أَتَانِيْ جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِيْ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِيْ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ».

খাল্লাদ ইবনু সায়িব তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'জিবরীল আমার কাছে আসলেন, অতঃপর আমাকে বললেন যে, আমি আমার ছাহাবীদের আদেশ দেই, তারা যেন উঁচু আওয়াজে তালবিয়া পাঠ করে'।[৩] এই হাদীছে বুঝা যায়, তালবিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়তে হবে।

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْعَجُّ وَالثَّجُّ».

আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? নবী করীম ﷺ বললেন, 'আমলের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আমল ঐ হজ্জ, যাতে উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করা হয় এবং কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করা হয়'।[৪] মুত্ত্বালিব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ-এর ছাহাবীগণ উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়তেন। এমনকি তাদের কণ্ঠ খুব বেশি উঁচু হতো।[৫] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে হবে।

মহিলারা সরবে তালবিয়া পাঠ করতে পারে : ফেতনার অশঙ্কা না থাকলে মহিলারা উচ্চ কণ্ঠে তালবিয়া পাঠ করতে পারে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) উঁচু কণ্ঠে তালবিয়া পাঠ করতেন, এমনকি পাশের পুরুষ লোকেরা শুনতে পেত।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَسَمِعَ صَوْتَ تَلْبِيَةٍ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا عَائِشَةُ اعْتَمَرَتْ مِنَ التَّنْعِيمِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ لَوْ سَأَلَنِي لأَخْبَرْتُهُ.

আব্দুর রহমান ইবনু কাসেম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার রাতে মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বের হলেন। তিনি তালবিয়ার শব্দ শুনলেন, তিনি বললেন, ইনি কে? সবাই বলল, ইনি আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)। তিনি 'তানঈম' হতে উমরা করছেন। মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর বিষয়টি আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর কাছে বলা হলে তিনি বললেন, মুআবিয়া আমাকে জিজ্ঞেস

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৫৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৬৮।
২. তিরমিযী, হা/৮২৮; মিশকাত, হা/২৫৫০, 'ছহীহ'।
৩. আবূ দাঊদ, হা/১৮১৪; মিশকাত, হা/২৫৪৯।
৪. তিরমিযী, হা/৮২৭; ইবনু মাজাহ, হা/২৯২৪।
৫. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ফাতহুল বারী, হা/১৫৪৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

করলে আমি তাকে উত্তর দিতাম।[৬] এই হাদীছ প্রমাণ করে মহিলারা সরবে তালবিয়া পাঠ করতে পারে। আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছটি পেশ করেন এবং বলেন, আহমাদ ইবনু তায়মিয়্যা (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'হজ্জের নিয়মনীতি' নামক বইয়ে মহিলাদের সরবে তালবিয়া পাঠ করার কথা উল্লেখ করেছেন।[৭]

তালবিয়া পড়া জরুরী : তালবিয়া পাঠ করা জরুরী। কারণ তালবিয়া হলো হজ্জের প্রতীক। উপরের হাদীছগুলো তার প্রমাণ। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ 'আমি যেন মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে দেখছি তিনি ছানিয়্যা পাহাড় হতে নিচের দিকে যাচ্ছেন, তখন তিনি বিনয়ের সাথে উঁচু কণ্ঠে তালবিয়া পাঠ করছেন'।[৮] যায়েদ ইবনু খালেদ আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'জিবরীল (আলাইহিস সালাম) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, আপনি আপনার ছাহাবীদের উঁচু কণ্ঠে তালবিয়া পাঠ করার জন্য আদেশ করেন। নিশ্চয় তালবিয়া হলো হজ্জের প্রতীক'।[৯] আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে বের হলাম। আমরা 'রাওহা' নামক স্থানে না পৌঁছাতেই জনগণের উঁচু কণ্ঠে তালবিয়া পাঠ শুনতে পেলাম।[১০]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا 'আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং আমরা উচ্চৈঃস্বরে হজ্জের তালবিয়া বলতে থাকলাম'।[১১] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, كُنْتُ رَدِيفَ أَبِيْ طَلْحَةَ وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ 'আমি আবূ তালহার সাথে একই বাহনের পিছনে ছিলাম। তারা সবাই এক সাথে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলছিলেন'।[১২] ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুলহুলায়ফায় ক্বছর করে আছরের দুই রাকআত ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর তার উটনী তাঁকে নিয়ে যুলহুলায়ফার মসজিদের পাশে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন তিনি এই শব্দগুলো দিয়ে তালবিয়া পড়লেন। তিনি বললেন, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। আমি তোমার নিকট সৌভাগ্য লাভ করছি। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে। আমি উপস্থিত আছি তোমর নিকট। আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমার নিকট এবং সব কর্ম তোমার আদেশে।[১৩] জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিদায় হজ্জের বিবরণে বলেন, ছাহাবীগণ এভাবে তালবিয়া বলতেন, لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ وَلَبَّيْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ 'হে আকাশের দিকে চড়ে যাওয়ার সিঁড়িসমূহের মালিক! আমি তোমার নিকট উপস্থিত। হে অনুগ্রহসমূহের মালিক! আমি তোমার নিকট উপস্থিত'।[১৪]

উক্ত হাদীছগুলো তালবিয়া পাঠের গুরুত্ব বহন করে এবং বিভিন্ন শব্দে তালবিয়া পাঠ করার প্রমাণ বহন করে।

তালবিয়া পাঠের পূর্বে তাকবীর পাঠ করা ভালো : হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় চার রাকআত যোহরের ছালাত আদায় করলেন, আমরাও তাঁর সাথে চার রাকআত আদায় করলাম। আর যুলহুলায়ফায় এসে আছরের ক্বছর দুই রাকআত আদায় করলাম। তিনি সেখানে রাত অতিবাহিত করলেন। এমনকি সকাল হয়ে গেল। তারপর তিনি বাহনে আরোহণ করলেন। বাহন যখন তাঁকে নিয়ে 'বায়দা' নামক স্থানে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন তিনি আল-হামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বললেন। তারপর তিনি হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধলেন আর ছাহাবীগণও হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধলেন। অতঃপর যখন মক্কায় আসলাম, তখন ছাহাবীদের (উমরা) করার পর হালাল হয়ে যেতে বললেন। তারপর যখন যুলহিজ্জার ৮ তারিখ আসলো, তখন সবাই হজ্জের ইহরাম বাঁধল। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেদিন দাঁড়ানো অবস্থায় অনেক কুরবানী করেছিলেন। তবে তিনি মদীনায় দুটি সাদা-কালো ভেড়া কুরবানী করেছিলেন।[১৫] এই হাদীছে বুঝা যায়, ইহরাম বাঁধার পূর্বে তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার করা ভালো।

(চলবে)

---

৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/১৪৮৮৫।
৭. আলবানী, মানাসিকুল হজ্জ ওয়াল উমরা, পৃ. ১৮।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৬।
৯. বায়হাক্বী, হা/৯০৯২।
১০. বায়হাক্বী, হা/৯১০০।
১১. ছহীহ মুসলিম, হা/১২৪৭; মিশকাত, হা/২৫৪৩।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/২৯৮৬; মিশকাত, হা/২৫৪৪।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৮৪; আবূ দাঊদ, হা/১৮১২; মিশকাত, হা/২৫৫১।
১৪. বায়হাক্বী, হা/৯১১৩।
১৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৫১।

www.al-itisam.com

ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা বনাম হানাফীদের আক্বীদা

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-২১)

(৫) অসীলা ধরা : চারিদিকে অসীলার ছড়াছড়ি। জীবিত বা মৃত মানুষকে অসীলা ধরার প্রচলন তো আছেই; সাথে অন্যান্য পশু-প্রাণীসহ গাছ-পাথরের মতো জড়বস্তুকেও অসীলা বানাতে মানুষ লজ্জাবোধ করে না। দুঃখজনক হলো, এ তালিকায় হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মালম্বীদের সাথে অনেক মুসলিমও যুক্ত হয়েছে। আমাদের দেশের অসংখ্য মুসলিম বেহিসাব অসীলা ধরে চলেছে। জীবিত বা মৃত তথাকথিত অসংখ্য পীর-মুরশিদ, অলি-আউলিয়াকে তারা অসীলা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে নিজের দাবী-দাওয়া পেশ না করে এসব অসীলার মাধ্যমে পেশ করছে। এমনকি কেউ কেউ আরো আগ বাড়িয়ে সরাসরি তাদের কাছেই চাচ্ছে! -নাঊযুবিল্লাহ- এভাবে তাদের মহান রবের মাঝে ও নিজেদের মাঝে অসীলা নামক দেওয়াল তৈরি হচ্ছে; মহান আল্লাহর সাথে শিরক সঙ্ঘটিত হচ্ছে। মহান আল্লাহ ক্রোধান্বিত হচ্ছেন। অথচ তিনি সরাসরি তাঁর বান্দার প্রার্থনা শুনতে চান। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ ‘যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে, আমি তো (তাদের) নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দেই। সুতরাং তাদের উচিত, আমার নির্দেশ মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যাতে তারা সরলপথ প্রাপ্ত হয়’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৬)*। তাহলে অসীলা নামক দেওয়াল দিয়ে আপনার খুব কাছের রবকে কেন দূরে ঠেলে দিচ্ছেন? তিনিই তো আপনাকে সরাসরি ডাকতে বলছেন। যাহোক, এসব অসীলা গ্রহণের মধ্য দিয়ে অসীলাগ্রহণকারী মুসলিমদের ও মক্কার কাফের-মুশরিকদের মাঝের পার্থক্যের দেওয়াল দুমড়ে-মুচড়ে পড়ছে। কারণ এদের মতো মক্কার কাফেরদের অধিকাংশই আল্লাহকে রব, সৃষ্টিকর্তা, রিযক্বদাতা, পরিচালনাকারী হিসেবে স্বীকার করত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ ‘যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ’ *(আয-যুখরুফ, ৪৩/৯)*। কিন্তু তারা তাঁর সাথে অন্যান্য মূর্তি, দেব-দেবীকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ ‘আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে’ *(আয-যুমার, ৩৯/৩)*। আর সে কারণেই তারা মুমিন হতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ ‘তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, তবে (ইবাদতে) শিরক করা অবস্থায়’ *(ইউসুফ, ১২/১০৬)*। তারা অসীলা গ্রহণ করলেও সাধারণত মন্দ কাউকে অসীলা বানাতো না। এরপরও আল্লাহ তাদেরকে কাফের ও মুশরিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামের ঘোষণা দিয়েছেন। আর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের রক্ত ও মালকে বৈধ গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন। অথচ আমাদের সমাজের যারা অসীলা ধরছে, তারা লেংটা-নোংরা মানুষকে পর্যন্ত অসীলা হিসেবে গ্রহণ করছে। তাদেরকে অসীলা করে আল্লাহর কাছে দু‘আ-প্রার্থনা করছে। কেউ-বা সরাসরি তাদের কাছেই চাচ্ছে— যা বড় শিরক, যা একজন মুসলিমকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। তাহলে এদের অবস্থা কী হতে পারে?!

প্রিয় পাঠক! দুঃখজনকভাবে এসব অসীলা ধরার ব্যাপারগুলো আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হানাফী ভাইদের মাঝে চর্চা হয়। ফলে মানুষ এটাকে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা বলে মনে করে। অন্তত হানাফী আক্বীদা মনে করতে মানুষ ভুল করে না। অথচ এটা না ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা, না হানাফী আক্বীদা। খোদ ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে গেছেন, لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ اللهَ تَعَالَى إِلَّا بِهِ ‘কারো জন্য মহান আল্লাহকে তাঁর অসীলা ছাড়া (অন্যের অসীলায়) ডাকা উচিত নয়’।[১] ‘তাঁর অসীলা ছাড়া’-এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে আবেদীন লিখেছেন, أَيْ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. ইবনে আবেদীন, রদ্দুল মুহতার আলাদ-দুর্রিল মুখতার, (দারুল ফিকর, বৈরূত, ২য় প্রকাশ : ১৪১২ হি./১৯৯২ খৃ.), ৬/৩৯৬; আলূসী, জালাউল আইনাইন ফী মুহাকামাতিল আহমাদাইন, (মাত্বাআতুল মাদানী, প্রকাশকাল : ১৪০১ হি./১৯৮১ খৃ.), পৃ. ৫৫১।

www.al-itisam.com

'অর্থাৎ তাঁর সত্তা, গুণাবলি ও নামসমূহের অসীলা ছাড়া'।[২] উল্লেখ্য, মহান আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ ও গুণাবলির ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ)-এর একটি চিরন্তন বাণী[৩] যেমন জাহমী ও তার বশংবদ মাতুরী-আশআরীদের মূল শেকড় কেটে দিয়েছে, তেমনি ইমাম আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর দ্ব্যর্থহীন এ বক্তব্যটি ছূফী ও কবরপূজারীদের মতো মূর্তিপূজারী মুশরিকদের মূল শেকড় কেটে দিয়েছে।[৪] এমনিভাবে যুগে যুগে অন্য হানাফী বিদ্বানগণও এ ব্যাপারে আপসহীন বক্তব্য দিয়ে গেছেন। মুহাম্মাদ আবেদ সিন্দী হানাফী বলেন, 'এমন যেন না বলে, হে কবরবাসী! হে অমুক! আমার প্রয়োজন পূরণ করুন। অথবা আপনিই আল্লাহর কাছে আমার প্রয়োজনটুকু চান। অথবা আপনি আল্লাহর নিকটে আমার জন্য শাফাআত করুন। বরং যেন এভাবে বলে, হে আমার সেই সত্তা, যার কোনো শরীক নেই! আপনিই আমার এই প্রয়োজন পূরণ করুন'।[৫] এভাবে হানাফী মাযহাবসহ অন্য তিন মাযহাবের আলেম-উলামাও এসব শরীআতনিষিদ্ধ অসীলার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছেন। অতএব, এসবের দায়ভার তাদেরকেই গ্রহণ করতে হবে, যারা এগুলোর চর্চা করছে। এরা আসলে হানাফী নয়; বরং কবর ও ব্যক্তিপূজারী।

আসলে ইসলামের দৃষ্টিতে অসীলা কী? —সেটাই আমরা বুঝিনি। যার কারণে এই পদস্খলন। মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর অসীলা বা নৈকট্য অনুসন্ধান করো এবং তাঁর পথে জিহাদ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো' *(আল-মায়েদা, ৫/৩৫)*। এখানে অসীলা বলতে কখনই উপরে বর্ণিত অসীলা নয়। অন্যান্য আলেম-উলামার মতো হানাফী আলেম-উলামাও অসীলার উক্ত অর্থ করেননি। হানাফীসহ অন্যান্য আলেম-উলামার মতে, অসীলা হচ্ছে— هُوَ التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ، وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ 'আনুগত্যের কাজ সম্পাদন ও মন্দ কাজ বর্জনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টাই হচ্ছে অসীলা'।[৬] ইসলামের দৃষ্টিতে অসীলা দুই প্রকার :

১. বৈধ অসীলা : সৎআমলকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অসীলা বা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার নাম বৈধ অসীলা। আর যে কোনো আমল সৎ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা সম্পাদন করা এবং তাতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদর্শিত পদ্ধতি তথা সুন্নাতের অনুসরণ থাকা। যেমন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে অসীলা হিসেবে গ্রহণ, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের অনুসরণকে অসীলা হিসেবে গ্রহণ অথবা আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ যে কোনো আমলকে অসীলা হিসেবে গ্রহণ। এই অসীলা সম্পর্কেইতো মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ﴾ 'আর তোমরা তাঁর নিকট অসীলা অন্বেষণ করো' *(আল-মায়েদা, ৫/৩৫)*। সুতরাং কেউ এভাবে প্রার্থনা করতে পারে, হে আল্লাহ! আপনার প্রতি আমার একনিষ্ঠতা এবং আমা কর্তৃক আপনার রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগতের মাধ্যমে আপনি আমাকে সুস্থতা ও রিযিক্ব দান করুন। যেমনটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেওয়া তিন ব্যক্তিকে একখণ্ড পাথর এসে গুহায় আটকিয়ে দিলে তারা তাদের সৎআমলকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন এবং আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন।[৭] অনুরূপভাবে কোনো সৎব্যক্তির দু'আকে অসীলা বা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ। ফলে কেউ কোনো সৎব্যক্তিকে বলতে পারে, আপনি আমার জন্য একটু দু'আ করবেন। যেমনিভাবে ছাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর দু'আর শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাঁদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন।[৮]

২. অবৈধ অসীলা : আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়— এমন অসীলাকে অবৈধ অসীলা বলে। যেমন : মৃত ব্যক্তিকে অসীলা হিসেবে গ্রহণ করে তার কাছে সাহায্য ও শাফাআত চাওয়া। আর এই অসীলা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন— যদিও সেই মৃত ব্যক্তি নবী কিংবা অলী হন।

আল্লাহ আমাদের ছহীহ বুঝ দান করুন এবং আমরণ তাওহীদের উপর অবিচল রাখুন- আমীন!

---

২. রদ্দুল মুহতার আলাদ-দুর্রিল মুখতার, ৬/৩৯৬।

৩. ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ)-কে যখন আল্লাহ কর্তৃক আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, اَلِاسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ 'এর অর্থ জানা আছে। তবে তার ধরন জানা নেই। এর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব এবং ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা বিদআত। আমি তোমাকে বিদআতী দেখতে পাচ্ছি'। অতঃপর তিনি প্রশ্নকারীকে সেখান থেকে বের করে দেওয়ার আদেশ করেছিলেন *(যাহাবী, আল-আরশ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় প্রকাশ : ১৪২৪ হি./২০০৩ খৃ.), ১/১৮৯)*।

৪. জুহূদু উলামাইল হানাফিয়্যাহ ফী ইবত্বালি আক্বাইদিল কুবূরিয়্যাহ, ২/১১২৩।

৫. ত্বওয়ালি'উল আনওয়ার শারহু তানবীরিল আবছার মা'আদ দুর্রিল মুখতার (এই লিঙ্ক থেকে সংগৃহীত: http://www.saaid.net/kutob/11.htm)।

৬. দ্রষ্টব্য : জুহূদু উলামাইল হানাফিয়্যাহ ফী ইবত্বালি আক্বাইদিল কুবূরিয়্যাহ, ৩/১৪৪৭-৪৮।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/২১২৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৬৯৯।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৫ ও ৩৪৪৫।

www.al-itisam.com

(৬) খানকা-মাযারে মানত করা : বাংলাদেশে হাজার হাজার খানকা, মাযার ও পীরের দরগাহ রয়েছে। এসব আস্তানায় চলে হরেক রকম শিরক, কুফর, বিদআত, কুসংস্কার ও নোংরামি চর্চা। বহুসংখ্যক খানকা, মাযার ও পীরের দরগায় নানান আশায় বুক বেঁধে মানুষ গরু, ছাগল, টাকা-পয়সাসহ অনেক কিছু মানত করে। আর এভাবে চলে বিনাপুঁজির রমরমা ব্যাবসা। আর যারা এর সাথে জড়িত, তাদের প্রায় সবাই হানাফী বলে এটাকে হানাফী আক্বীদা-আমল বলে মানুষ মনে করে। এটাকে হানাফী আক্বীদা মনে করার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে, যুগে যুগে কিছু নামধারী আলেম একাজকে প্রমোট করে এসেছে। কবরপূজারীদের একজন বড় আলেম কুযাঈ মৃতের জন্য মানত সম্পর্কি একটি অধ্যায় রচনা করেন এভাবে, فَصْلٌ فِيْ تَوْضِيْحِ بُطْلاَنِ الْقَوْلِ بِأَنَّ الذَّبْحَ لِلْمَيِّتِ وَالنَّذْرِ لَهُ شِرْكٌ، وَتَحْقِيْقُ أَنَّ ذَلِكَ [أَيْ النَّذْرَ لِلْمَيِّتِ] مِنَ الْقُرَبِ الْوَاصِلِ نَفْعُهَا إِلَى الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ جَمِيْعاً ‘অধ্যায় : মৃত ব্যক্তির জন্য জবাই করা, তার জন্য মানত করা শিরক মর্মের বক্তব্যটি স্পষ্ট বাতিল। সঠিক কথা হচ্ছে, মৃতের জন্য মানত করা এমন নৈকট্য হাছিলের মাধ্যম, যার ফায়দা জীবিত-মৃত সবার কাছেই পৌঁছে’।[৯] আরেকজন কবরপূজারী আলেম ক্বব্বানী বলেছেন, فَإِنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ أَوْ لِلرَّسُلِ تَعْظِيْماً لِكَوْنِهَا بَيْتَ اللهِ أَوْ لِكَوْنِهِمْ رُسُلَ اللهِ، جَازَ ‘কা‘বা আল্লাহর ঘর হওয়ার কারণে বা রাসূলগণ আল্লাহর রাসূল হওয়ার কারণে যদি কা‘বার উদ্দেশ্যে বা রাসূলগণের উদ্দেশ্যে এতদুভয়ের সম্মানার্থে (পশু) জবাই করে, তাহলে তা জায়েয’।[১০]

নাঊযুবিল্লাহ মিন যালিক। এটা ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর আক্বীদা বা হানাফী আক্বীদা হওয়া তো দূরের কথা, এটা কোনো মুসলিমের আক্বীদা হতে পারে না। সেকারণে যুগে যুগে ইসলামিক স্কলারগণ এটাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন; এমনকি হানাফী বিদ্বানগণও। হানাফী বিদ্বান ক্বাসেম ইবনে কুতলূবুগা রহিমাহুল্লাহ বলেন, وَأَمَّا النَّذْرُ الَّذِي يُنْذِرُهُ أَكْثَرُ الْعَوَامِّ عَلَى مَا هُوَ مُشَاهَدٌ كَأَنْ يَكُونَ لِإِنْسَانٍ غَائِبٌ أَوْ مَرِيضٌ، أَوْ لَهُ حَاجَةٌ ضَرُورِيَّةٌ فَيَأْتِي بَعْضَ الصُّلَحَاءِ فَيَجْعَلُ سُتْرَةً عَلَى رَأْسِهِ فَيَقُولُ يَا سَيِّدِي فُلَانٌ إِنْ رُدَّ غَائِبِي، أَوْ عُوفِيَ مَرِيضِي أَوْ قُضِيَتْ حَاجَتِي فَلَكَ مِنْ الذَّهَبِ كَذَا، أَوْ مِنْ الْفِضَّةِ كَذَا، أَوْ مِنْ الطَّعَامِ كَذَا، أَوْ مِنْ الْمَاءِ كَذَا، أَوْ مِنْ الشَّمْعِ كَذَا، أَوْ مِنْ الزَّيْتِ كَذَا فَهَذَا النَّذْرُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ لِوُجُوهٍ ‘অধিকাংশ সাধারণ জনগণ যে মানত করে, যেটা আমরা দেখে থাকি, যেমন— কারো কেউ হারিয়ে গেলে বা অসুস্থ হলে বা জরুরী কোনো প্রয়োজন পড়লে সে কোনো নেককার ব্যক্তির কাছে এসে মাথায় পর্দা দিয়ে বলে, হে আমার অমুক নেতা! যদি আমার হারানো ধন ফিরিয়ে দেওয়া হয় বা আমার রোগী আরোগ্য লাভ করে বা আমার প্রয়োজন পূরণ করা হয়, তাহলে আপনাকে এত এত সোনা, রূপা, খাদ্য-পানীয়, মোমবাতি, তেল ইত্যাদি দিবো— তবে এই মানত কয়েকটি কারণে ইজমার ভিত্তিতে বাতিল’।[১১] ইবনে কুতলূবুগা রহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন পরবর্তীকালের অনেক হানাফী বিদ্বান। যেমন— ইবনু নুজাইম, যাকে আবূ হানীফা আছ-ছানী বলা হয়, খয়রুদ্দীন রমলী, আলাউদ্দীন হাছকাফী, ইবনে আবেদীন, রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী, শুকরী আল-আলূসী, আলী মাহফূয হানাফী প্রমুখ।[১২]

প্রিয় পাঠক! মনে রাখবেন, মানত একটি ইবাদত, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলে শিরক হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ নেককার বান্দাদের প্রশংসায় বলেন, ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ ‘তারা মানত পূর্ণ করে’ *(আদ-দাহর, ৭৬/৭)*। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মানত করবে, সে যেন তার আনুগত্য করে। আর যে তার অবাধ্যতার মানত করবে, সে যেন তার অবাধ্যতা না করে’।[১৩]

সুতরাং মানত হতে হবে একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহর জন্য। যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, তাহলে তা শিরকে আকবার বা বড় শিরকে পরিণত হবে, যা ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দিবে। আর যদি খানকা-মাযার-কবরে গিয়ে জবাই করে, কিন্তু আল্লাহর জন্যই করে, কবরবাসীর জন্য না করে, তাহলে তাও হারাম হবে। কারণ তা শিরকের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়।[১৪] আল্লাহর জন্য মানত করলেও যদি তা কবরের নিকট জবাই করা হয়, তবে তা না জায়েয হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের উলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন।[১৫]

এতকিছুর পরও কি আপনি খানকা-মাযারে ও পীরের দরবারে গরু, ছাগল, খাদ্য-খাবার, টাকা-পয়সা ইত্যাদি নিয়ে হাযির হবেন?

(চলবে)

---

৯. আল-বারাহীন আস-সাত্বে‘আহ, পৃ. ৪৫৬-৪৭০, ভায়া : জুহূদু উলামাইল হানাফিয়্যাহ ফী ইবত্বালি আক্বাইদিল কুবূরিয়্যাহ, ৩/১৫৪৬।

১০. ফাছলুল খিত্বাব, পৃ. ৩০, ভায়া : জুহূদু উলামাইল হানাফিয়্যাহ ফী ইবত্বালি আক্বাইদিল কুবূরিয়্যাহ, ৩/১৫৪৫।

১১. আল-বাহরুর রয়েক্ব শারহু কানযিদ দাক্বাইক্ব, ২/৩২০।

১২. জুহূদু উলামাইল হানাফিয়্যাহ ফী ইবত্বালি আক্বাইদিল কুবূরিয়্যাহ, ৩/১৫৫০।

১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৯৬।

১৪. ফাওযান, ই‘আনাতুল মুস্তাফীদ বিশারহি কিতাবিত তাওহীদ, (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ: ১৪২৩ হি./২০০২ খৃ.), ১/২৮৩।

১৫. দ্রষ্টব্য : তাবঈনুল হাক্বায়েক্ব, ১/২৪৬; মাওয়াহিবুল জালীল, ২/২২৮; আল-মাজমূ‘, ৫/৩২০; আল-ইনছাফ, ২/৫৬৯।

www.al-itisam.com

লোক দেখানো আমলের পরিণতি

-ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর*

(পর্ব-২)

লোক দেখানো আমলকারীর পরিণতি : *

প্রদর্শনের জন্য আমল করাকে ইসলামে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। লোক দেখানো আমলকারীকে পরকালে কঠিন পরিণতির শিকার হতে হবে। লোক দেখানো আমল করতে নিষেধ করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খায়রাত বরবাদ করো না ঐ ব্যক্তির মতো, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৪)*। অপর এক আয়াতে এরূপ আমলের স্বরূপ বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ ‘(আমি ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তারা যেসব আমল করবে) আমি তাদের সেসব কর্মের দিকে মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দিব’ *(আল-ফুরক্বান, ২৫/২৩)*। এমর্মে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِى الدُّنْيَا رِئَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا.

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ‘কিয়ামতের দিন আমাদের প্রভু স্বীয় পায়ের পিণ্ডলী পর্যন্ত খুলবেন, তখন তাকে প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারী সিজদা করবে। আর যারা পৃথিবীতে মানুষকে দেখানোর এবং শুনানোর জন্য সিজদা করত, তারাই শুধু (সিজদা করা হতে) অবশিষ্ট থাকবে। তারাও সিজদা করতে চাইবে; কিন্তু তাদের পিঠ কাঠের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে, ফলে সিজদা করতে পারবে না’।[১] দুনিয়াতে যেভাবে মুনাফিক্বের মতো সিজদা করতো, তারাও সেই দিন অন্যান্য মানুষের ন্যায় সিজদা করতে চাইবে। কিন্তু সিজদার জন্যে যখন সামনের দিকে ঝুঁকতে চাইবে, তখন মেরুদণ্ড কাঠের ন্যায় শক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সামনের দিকে ঝুঁকতে পারবে না।

অন্য হাদীছে এসেছে, জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ ‘যে ব্যক্তি সুনাম অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ-ত্রুটিকে লোকসমাজে প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য কোনো কাজ বা আমল করে, আল্লাহ তাআলাও তার সাথে লোক দেখানোর মতো ব্যবহার করবেন’ (আমলের প্রকৃত ছওয়াব হতে সে বঞ্চিত হবে)।[২]

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় সুফিয়ান ছাওরী রাহিমাহুল্লা-হু বলেন, যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত হয়ে আল্লাহর জন্য ইবাদত করবে না, বরং মানুষকে দেখানো কিংবা শুনানোর জন্য করবে, মহান আল্লাহ তার সাথে অনুরূপই আচরণ করবেন।[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ ‘যে ব্যক্তি লোককে শুনাবার জন্য (সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে) আমল করবে, আল্লাহ তার সেই (বদ নিয়্যতের) কথা সকল সৃষ্টির সামনে (কিয়ামতে) প্রকাশ করে তাকে ছোট ও লাঞ্ছিত করবেন’।[৪] ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, কিছু লোক তাঁর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমরা আমাদের শাসকদের নিকট যাই এবং তাদেরকে ঐ সব কথা বলি, যা তারা পছন্দ করে। কিন্তু তাদের নিকট থেকে বাইরে আসার পর তার বিপরীত কথা বলি। (সে ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু উত্তর দিলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় এরূপ আচরণকে আমরা মুনাফিক্বী আচরণ বলে গণ্য করতাম’।[৫]

উবাই ইবনু কা‘ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, بَشِّرْ هَذِهِ الأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِي الأَرْضِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الآخِرَةِ نَصِيبٌ ‘এই

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯১৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৭৩৭৭; দারেমী, হা/২৮০৩; মুসনাদে আবী আওয়ানা, হা/৪৩৩; মিশকাত, হা/৫৫৪২।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৯৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬৬৮; তিরমিযী, হা/২৩৮১; ইবনু মাজাহ, হা/৪২০৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/১১৩৭৫; মিশকাত, হা/৫৩১৬।

৩. হুসাইন ইবনু মাসঊদ আল-বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ হি.), ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩২৩।

৪. মুসনাদে আহমাদ, হা/৭০৮৫; ত্বাবারানী আওসাত্ব, হা/৪৯৮৪; বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/৬৮২২; কানযুল উম্মাল, হা/৭৫৩৫; ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৫, সনদ ছহীহ।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৭১৭৮; আল-মুসনাদুল জামে‘, হা/৮২৭৬।

www.al-itisam.com

উম্মতকে স্বাচ্ছন্দ্য, সুউচ্চ মর্যাদা, বিজয় এবং দেশসমূহে তাদের ক্ষমতা বিস্তারের সুসংবাদ দাও। কিন্তু যে ব্যক্তি পার্থিব কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরকালের কর্ম করবে, তার জন্য পরকালে প্রাপ্য কোনো অংশ নেই'।[৬]

মানুষকে দেখানো কিংবা শুনানোর জন্য আমল করা মুনাফিক্বী আচরণ, যা ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ হিসেবে বর্ণনা হয়েছে। যারা অপরকে দেখানো বা সুনাম অর্জনের জন্য আমল করবে, মহান আল্লাহ তাদের সাথে অনুরূপই ব্যবহার করবেন। শেষ দিবসে তাদেরকে সকল মানুষের সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে ছাড়বেন। তাদের এ নোংরা মানসিকতা সকলের সামনে প্রকাশ করে দিবেন। পরকালে তারা তাদের কৃতকর্মের কোনো প্রতিদান পাবে না। এমনকি দুনিয়া অর্জনের জন্য যারা পরকালীন কোনো কাজ করবে, তাদের অবস্থাও একই হবে। শেষ দিবসে আহূত হয়ে তারা আল্লাহকে সিজদা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। কিন্তু কোনোভাবেই সক্ষম হবে না। বরং তাদের আমলগুলো তিনি বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দিবেন। কেননা তারা লোকদেখানো ও প্রশংসা অর্জন নামক শিরক ও হারাম কর্মে লিপ্ত ছিল। ইমাম গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'জেনে রাখো, নিশ্চয় প্রদর্শনপ্রিয়তা হারাম। প্রদর্শনীর জন্য আমলকারী আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যক্তি। আয়াত, হাদীছ ও পূর্ববর্তী আলেমগণের বক্তব্য দ্বারা তা প্রমাণিত'।[৭]

লোক দেখানো আমলকারীর শেষ ঠিকানা জাহান্নাম :

মানুষকে দেখানো ও শুনানোর জন্য আমল করা ইসলামে নিষেধ। এরূপ কর্মে ব্যক্তির অহংকার ও নোংরা মানসিকতা ফুটে উঠে। লোক দেখানো আমলকারীর শেষ পরিণাম হবে জাহান্নাম। সে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾ 'অতঃপর মহা দুর্ভোগ বা ধ্বংস ঐ সব মুছল্লীর জন্য, যারা তাদের ছালাতের ব্যাপারে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য আমল করে' *(আল-মাঊন, ১০৭/৪-৬)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيْهِ؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى أُسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَّفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য পেশ করা হবে, সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে স্বীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। আর সেও তা স্মরণ করবে। তারপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এত নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছ? সে উত্তরে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি লড়াই করেছ এজন্য যে, তোমাকে বীরযোদ্ধা বলা হবে। এমনকি তোমাকে তা বলাও হয়ে গেছে। অতএব তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে। তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে, যে নিজে ইলম শিক্ষা করেছে ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন অধ্যয়ন করেছে। আল্লাহ তাকে তাঁর নিয়ামত স্মরণ করাবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, এ নিয়ামতের জন্য তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি ইলম শিক্ষা করেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন অধ্যয়ন করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্য ইলম শিক্ষা করেছ, যেন তোমাকে বিদ্বান বলা হয় এবং এজন্য কুরআন পড়েছ, যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়। তোমাকে বিদ্বান ও ক্বারী বলা হয়ে গেছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে, যাকে আল্লাহ বিপুল সম্পদ দান করেছেন। আল্লাহ প্রথমে তাকে তার নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন এত কিছু নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে, যেসব ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পসন্দ কর, তা হাতছাড়া করিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য সবক্ষেত্রেই সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্য দান করেছ যে, তোমাকে দানবীর বলা হবে। এমনকি তোমাকে তা বলাও হয়ে গেছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, তাকে উপুড় করে টেনেহেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৮]

(চলবে)

---

৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৪০৫; মুসতাদরাকে হাকেম, হা/৭৮৬২; শুআবুল ঈমান, হা/৬৮৩৩; ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৩; ছহীহুল জামে', হা/২৮২৫, সনদ হাসান।

৭. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮০।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৩২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯০৫; নাসাঈ, হা/৩১৩৭; আহমাদ, হা/৮২৬০; মুসতাদরাকে হাকেম, হা/৩৬৪; শুআবুল ঈমান, হা/৬৮০৫; আবূ আওয়ানা, হা/৭৪৪১; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩৫১৮; মিশকাত হা/২০৫।

www.al-itisam.com

রক্তাক্ত ফিলিস্তীনের অতীত ও বর্তমান

-ড. মো. কামরুজ্জামান*

খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগের কথা। ফিলিস্তীনে জন্ম নিয়েছিলেন ইসহাক আলাইহিস সালাম, ইয়াকূব আলাইহিস সালাম, ইউসুফ আলাইহিস সালাম, যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম সহ অনেক নবী ও রাসূল আলাইহিস সালাম। ফিলিস্তীনের পার্শ্ববর্তী দেশ জর্ডানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নূহ আলাইহিস সালাম, লূত আলাইহিস সালাম ও আইউব আলাইহিস সালাম। আরেক পার্শ্ববর্তী দেশ লেবাননে জন্ম নেন ছালেহ আলাইহিস সালাম। আর পাশের দেশ মিশরে জন্ম নেন মূসা, হারূন ও শুআইব আলাইহিস সালাম। এসকল নবী-রাসূল আলাইহিস সালাম ছিলেন সমসাময়িক যুগের পথপ্রদর্শক ও সংশ্লিষ্ট দেশের জনপ্রতিনিধি। ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায়, ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর বংশধরেরা খ্রিষ্টপূর্ব ১৩শ বছর যাবতকাল ফিলিস্তীন শাসন করতেন। দাঊদ আলাইহিস সালাম তাঁর শাসনামলে জেরুজালেমে বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন। আর তাঁর পুত্র সুলায়মান আলাইহিস সালাম নির্মাণ কাজ শেষ করেছিলেন। এ মসজিদেই মি'রাজের রজনীতে সকল নবীর আগমন ঘটেছিল। আর শেষ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইমামতিতে ছালাত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যুর পর ফিলিস্তীনের শাসনভার গ্রহণ করেন তাঁরই পুত্র সুলায়মান আলাইহিস সালাম। আর এতসব কারণেই ফিলিস্তীন, জেরুজালেম ও বায়তুল মুক্বাদ্দাস মুসলিমবিশ্বে পূণ্যভূমি হিসেবে পরিচিত। নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর পরে ইতিহাসের গতিধারায় ফিলিস্তীনে ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও মুসলিমরা বসবাস করতে থাকে। কিন্তু ইয়াহূদীরা তাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে অন্যদেরকে পাত্তা না দিয়ে নিজেরা জুদাহ নামে একটি রাষ্ট্র গঠন করে। জেরুজালেমকে তারা রাজধানী ঘোষণা করে। এতে খ্রিষ্টান এবং মুসলিমগণ ক্ষুব্দ হয়ে ওঠে। ১৩২ সালে খ্রিষ্টান রাজা কনস্টানটিন (রোমান সম্রাট) ইয়াহূদীদেরকে জেরুজালেম থেকে বিতাড়িত করে। ফিলিস্তীন ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মভূমি হওয়ার কারণে খ্রিষ্টানদের কাছে সেটি হয়ে ওঠে বিশেষ পূণ্যভূমি। অবশ্য সপ্তম শতাব্দীতে রোমানরা মুসলিমদের কাছে পরাজিত হয়। ফিলিস্তীন চলে আসে আবার মুসলিম শাসনের অধীনে। এ সময় থেকে পরবর্তী ১২০০ বছর পর্যন্ত ফিলিস্তীন ছিল স্বাধীন এক মুসলিম জাতিরাষ্ট্রের নাম। হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন ইয়াহূদী এ সময় ফিলিস্তীনে বসবাস করত। রোমানদের কাছে পরাজিত হয়ে ইয়াহূদীরা ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। নীতিভ্রষ্টতার কারণে কোনো দেশেই তাদের জায়গা হয়নি। ভূমিহীন যাযাবর-রিফিউজি হিসেবে বিভিন্ন দেশের বস্তিতে তারা বসবাস করতে থাকে। সৃষ্টিলগ্নের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইয়াহূদীদের স্থায়ী কোনো বসতভিটা ছিল না। তারা কোনো জাতির সাথেই মিলেমিশে বাস করতে পারেনি। তাই এভাবেই তারা নির্বাসিত জীবনযাপন করতে থাকে। ওদিকে সৃষ্টির শুরু থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। তাই ইউরোপ-আমেরিকার লোভাতুর দৃষ্টি ছিল এসব দেশের প্রতি। তাই পূর্ব থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে তাদের একটি মিত্র ও বন্ধু রাষ্ট্র গঠনের বাসনা ছিল। ওদিকে যাযাবরি জীবন থেকে মুক্তির জন্য ইয়াহূদীরাও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করতে থাকে। আর এ লক্ষ্যে তারা গড়ে তোলে 'জায়নবাদি সংগঠন'। একদিকে ইউরোপ-আমেরিকার বাসনা, অন্যদিকে ইয়াহূদীদের পরিকল্পনা ত্বরান্বিত করতে থাকে ইয়াহূদী রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তুতি।

সপ্তম শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী। দীর্ঘ ১২০০ বছর। সুদীর্ঘ এ সময় পর্যন্ত ফিলিস্তীন বাংলাদেশের ন্যায় একটি মুসলিম জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে পরিচিত ছিল। সেখানে মুসলিমদের পাশাপাশি খ্রিষ্টান এবং স্বল্পসংখ্যক ইয়াহূদীও বসবাস করত। ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তীনে ইয়াহূদীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩.২ শতাংশ। ১৯১৪ সালে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফিলিস্তীন ছিল উছমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে। আর উছমানীয় সাম্রাজ্য ছিল ব্রিটিশ বলয়ের বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধে ব্রিটিশবলয় বিজয়ী হয়। ফলে উছমানীয় সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। আর ফিলিস্তীন চলে যায় ব্রিটিশদের অধীনে। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশকর্তৃক ফিলিস্তীন শোষিত হয়। ব্রিটিশরা ফিলিস্তীনিদেরকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দেওয়ার মিথ্যা আশ্বাস দেয়। এ আশ্বাসের উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তীনে তাদের শাসনসীমা দীর্ঘায়িত করে ইয়াহূদীদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা। এরই মধ্যে যুদ্ধ চলমান অবস্থায় ইয়াহূদী বিজ্ঞানী ড. হেইস বেইজম্যান দুর্লভ বোমা তৈরি করেন, যা ব্রিটিশদের যুদ্ধজয়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এ ভূমিকার উপহারস্বরূপ ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলফোর ফিলিস্তীনকে ইয়াহূদীদের হাতে তুলে দেওয়ার জোর প্রস্তুতি নিতে থাকে। শুরু হয় ইয়াহূদী বসতি স্থাপনের কার্যক্রম। ১৯২২ সালে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে জাহাজ ভর্তি ইয়াহূদীরা ফিলিস্তীনে আসতে শুরু করে। আর

* অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

তাদেরকে পুনর্বাসন করতে অর্থযোগান দিতে থাকে ব্রিটিশরা। এ দীর্ঘ সময়ে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ফিলিস্তীনকে আরব ও মুসলিম শূন্য করার কাজটি ভালোভাবে সেরে নেয়। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশরা ফিলিস্তীন ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু ততদিনে ইয়াহূদীরা ফিলিস্তীনের মাটির গভীরে শিকড় গেড়ে বসে। ১৯১৮ সালে ইয়াহূদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০ হাজারে উন্নীত হয়। ১৯২৩ সালে এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৩৫ হাজারে। ১৯৩১ সালে এ সংখ্যা এসে পৌঁছায় ১ লাখ ৮০ হাজারে। আর ১৯৪৮ সালে এ সংখ্যাটি উন্নীত হয় ৬ লাখে। ঠিক এ দীর্ঘ সময় ধরে ইয়াহূদীরা ব্রিটিশদের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত শক্তিশালী সন্ত্রাসী সংগঠন গড়ে তোলে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চলতে থাকে ফিলিস্তীনি মুসলিমদের উচ্ছেদ অভিযান। আর দ্রুততার সাথে চলতে থাকে ইয়াহূদীদের বসতিস্থাপন। ফলশ্রুতিতে ২০ লাখ বসতির মধ্যে ইয়াহূদীর সংখ্যা দাঁড়ায় গিয়ে ৬ লাখে। এভাবে স্বাধীন ইয়াহূদী রাষ্ট্র গঠনের কাজ এগিয়ে যেতে থাকে দ্রুতগতিতে। অবৈধ ও অযৌক্তিক রাষ্ট্রটি আন্তর্জাতিক বৈধতা পেতে জোর লবিং চালাতে থাকে। ওদিকে ১৪ মে ১৯৪৮ ফিলিস্তীন থেকে ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হওয়ার কথা। সুতরাং যা করবার করতে হবে অতি দ্রুত। ইয়াহূদী-ব্রিটিশের জোর লবিং বিষয়টিকে নিয়ে যায় তাই জাতিসংঘে। আর ব্রিটিশ-আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তীন নিয়ে 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' প্রস্তাব পাশ করে। প্রাচীন ফিলিস্তীন ভেঙে তৈরি হয় ফিলিস্তীন ও ইসরাঈল। ভারত, পাকিস্তান ও ইরান এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। কানাডা, চেকোস্লাভাকিয়া, পেরু, গুয়েতেমালা, নেদারল্যান্ড, রাশিয়া, আমেরিকা ও উরুগুয়ে ফিলিস্তীনকে বিভক্ত করার পক্ষে প্রস্তাব দেয়। মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হয়েও ৫৭% ভূমি পায় ইয়াহূদীরা। আর ৪৩% পায় ফিলিস্তীনিরা। এভাবেই পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত জাতিসংঘের মাধ্যমে পাশ হয়ে যায় একটি অবৈধ ও অযৌক্তিক প্রস্তাব। প্রতিষ্ঠিত হয় একটি অবৈধ রাষ্ট্র।

এ সিদ্ধান্তের পরপরই ফিলিস্তীনে নেমে আসে ইয়াহূদীদের ভয়াবহ আগ্রাসন। এ আগ্রাসনে তিন মাসেই নিহত হয় ১৭০০ মুসলিম। দিনে দিনে বেড়েই চলে তাদের নিষ্ঠুরতা। একটি দিনের জন্যও শান্তিতে ঘুমাতে পারেনি নিরীহ-নিরস্ত্র ফিলিস্তীনিরা। এ নির্মমতার মধ্যেই ইয়াহূদীরা ইসরাঈলের স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে, রাত তখন ১২টা ১ মিনিট। ইসরাঈলকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে ইয়াহূদী নেতা দাভিদ বেনগুরিয়ান। এ ঘোষণার মাত্র ১০ মিনিট পর ইসরাঈলকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান। অতঃপর স্বীকৃতি দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও রাশিয়া। এ স্বীকৃতির ঠিক ১ ঘণ্টার মধ্যেই আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ শুরু হয়। ইয়াহূদী সৈন্যরা ফিলিস্তীনের ৫০০টি গ্রামের ৪০০টিই জনশূন্য করে দেয়। ইয়াহূদী, ফরাসি আর ব্রিটিশ শক্তির কাছে সমন্বয়হীন এবং নেতৃত্বশূন্য আরবরা যুদ্ধে পরাজিত হয়। সম্পূর্ণ ফিলিস্তীন দখল করে নেয় ইসরাঈল। ফিলিস্তীনের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ শরণার্থীতে পরিণত হয়। সাত লক্ষ মুসলিম বাড়িছাড়া হয়। তারা লেবানন, সঊদী আরব, মিশরসহ বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসেবে জীবনযাপন করে। আজও তারা ফিরে পায়নি তাদের বাড়ি-ঘর। সেই থেকে ফিলিস্তীনিরা আজও পর্যন্ত নিজ দেশে হয়ে আছে পরবাসী। আন্তর্জাতিক সকল রীতি-নীতি উপেক্ষা করে ইসরাঈল প্রতিনিয়ত নির্মাণ করেই চলছে দেয়াল। চালিয়ে যাচ্ছে তাদের আগ্রাসী অভিযান। অব্যাহত রেখেছে তাদের উচ্ছেদ অভিযান। জবরদখল আর নৃশংসতায় ফিলিস্তীন এখন পরিণত হয়েছে এক ভয়ংকর মৃত্যুকূপে। আর রামাযান মাস আসলেই ইসরাঈল মুসলিমদের উপর তাদের এ নৃশংসতা বাড়িয়ে দেয়। গত ১০ মে ২৬শে রামাযান ইসরাঈল ফিলিস্তীনিদের উপর ব্যাপক হামলা শুরু করে। এ হামলা চলে টানা ১১ দিন। আর এতে প্রাণ হারায় ২৩২ জন শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও তরুণ-তরুণী। আর বরাবরের মতো এ হামলা ছিল এক তরফা। এক তরফা এ হামলায় ঈদের দিনেও নিহত হয়েছে ১৯ জন ফিলিস্তীনি। এর প্রতিবাদে বিশ্ববাসী শুধু নিন্দা করেই শেষ। ঘটেছে সাময়িক যুদ্ধবিরতি। এমন নিন্দা আর যুদ্ধবিরতি নতুন নয়। হামলা আর যুদ্ধবিরতির ঘটনা ১৯৪৮ থেকেই চলমান। বিশ্বনেতাদের নিন্দায় ফিলিস্তীনিরা পায় না তাদের অধিকার ও প্রতিকার। মুসলিমরা কোনোদিন পায়নি কোনো সুবিচার।

এটাই হলো প্রাচীন মুসলিম ফিলিস্তীনের বর্তমান নির্মম বাস্তবতা। ফিলিস্তীনিদের মাটিতে জাতিসংঘ জায়গা করে দিল ইয়াহূদীদের। কিন্তু ফিলিস্তীনিদের প্রতিশ্রুত রাষ্ট্রটি আজও প্রতিষ্ঠিত হলো না। ১৯৭৪ সাল থেকে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মর্যাদায় আছে ফিলিস্তীন ভূখণ্ডটি। স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা ফিলিস্তীন আজও পায়নি। ফিলিস্তীনিদের দাবি হলো, তাদের দেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেওয়া হোক। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রের পদ দেওয়া হোক। যাতে করে দেশটি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

www.al-itisam.com

জাতিসংঘের কোনো প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতে পারে। জাতিসংঘের নির্বাহী পদে নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করাতে পারে। তারা শুধু ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক বণ্টিত ৪৩% ভূমিটুকুই ফেরত চায়। যার সবটুকুই ইসরাঈল তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। আর এ ভূমিটুকু ফেরত পেতে প্রয়োজন জাতিসংঘের সদিচ্ছা। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নূন্যতম ৯টি রাষ্ট্র ভোট দিলেই কেবল এই মর্যাদা অর্জন করবে ফিলিস্তীন। নিরাপত্তা পরিষদে ভোটের ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র হলো : যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন। বাকি অস্থায়ী দশটি রাষ্ট্র হলো : ভারত, জার্মানি, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, পর্তুগাল, লেবানন, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, নাইজেরিয়া ও কলম্বিয়া। অর্থাৎ স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্রেরর মর্যাদা পেতে হলে— (১) উল্লেখিত ১৪টি রাষ্ট্রের মধ্য হতে ৯টি রাষ্ট্রের ভোট পেতে হবে। (২) স্থায়ী ৫ সদস্য রাষ্ট্রের কোনো একটি সদস্য দেশ ভেটো দেবে না। (৩) নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত এ প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত হবে। (৪) সাধারণ পরিষদের ১৯৩টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১২৮টি রাষ্ট্রের সমর্থন পেতে হবে। তবেই কেবল ফিলিস্তীন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পাবে। আর এ মর্যাদা পেতে দীর্ঘ ৭৩ বছর ধরে রক্ত ঝরাচ্ছে ফিলিস্তীনিরা। ফিলিস্তীনিদের এ দাবি নিরাপত্তা পরিষদে আটকে আছে ১৯৪৮ সাল থেকে। অবশ্য ফিলিস্তীনকে পূর্ণ সদস্য পদ দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। আর তাতে ক্ষেপে গিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছে সংস্থাটি। বার্ষিক ৬ কোটি ডলার তহবিল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যা ইউনেস্কোর বার্ষিক বাজেটের এক-পঞ্চমাংশ। অথচ সদস্যপদ দেওয়া বিষয়ে ইউনেস্কোতে ১৭৩টি দেশের মধ্যে ফিলিস্তীনের পক্ষে ভোট পড়ে ১০৭টি। বিপক্ষে পড়ে ১৪টি। ভোটদানে বিরত থাকে ৫২টি দেশ। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও জার্মানি সদস্যপদের বিরোধিতা করে ভোট দেয়। অন্যদিকে ফিলিস্তীনের দাবির সমর্থনে ভোট দেয় ব্রাজিল, চীন, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। আর ব্রিটেন থাকে নিরপেক্ষ অবস্থানে। মূলত ফিলিস্তীন ইসরাঈলের উচ্ছেদ চায় না। তারা শুধু বাঁচতে চায়। ইসরাঈলের উচ্ছেদ মানেই হলো ইউরোপ-আমেরিকা মহাদেশের উচ্ছেদ। এটা বিশ্বের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এছাড়া ইসরাঈল একটি পারমানবিক শক্তিধর দেশ। তাদের রয়েছে বোমারু বিমান, মিসাইল বোট, পেট্রোল বোট, সাবমেরিন ইত্যাদি। এর বিপরীতে ফিলিস্তীনের গুলতি, পাথর আর কিছু মাছ ধরার নৌকা ছাড়া কিছুই নেই। বিগত সাত দশকের অধিক সময় ধরে উচ্ছেদ অভিযানে নিষ্পেষিত ফিলিস্তীনিরা এখন বড়ই ক্লান্ত। আকাশপথে ঝাকে ঝাকে বোমারু বিমানের হামলা, স্থলপথে ট্যাংক, গানবোট আর কামানের গোলাবর্ষণে প্রতিনিয়ত উড়ে যাচ্ছে ফিলিস্তীনিদের হাত, পা, চোখ ও কান। থেতলে যাচ্ছে তাদের মাথা। আর ঝলসে যাচ্ছে দেহ ও মুখ। ১০ তলা ভবন নিমিষেই মিশে যাচ্ছে মাটির সাথে। প্রতিদিনের মিডিয়ায় ভেসে আসছে ফিলিস্তীনি অবুঝ শিশুদের নিষ্পাপ আর্তনাদ। অথচ ৮০০ কোটি বিশ্ববিবেক চুপচাপ। প্রতিবাদী পাথর কিংবা গুলতিটাই ছরবের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বমিডিয়ায়। সেখানেই ষড়যন্ত্র আর সন্ত্রাস খুঁজে ফিরে চলছে পশ্চিমা মিডিয়া। আর ঝাকবাঁধা বোমারু বিমান, ট্যাংক আর কামানের হামলা সেখানে ইসরাঈলের আত্মরক্ষার অধিকার! হায়রে মানবতা! হায়রে বিশ্ববিবেক! হায়রে জাতিসংঘ! বিশ্ববিবেকের কাছে প্রশ্ন হলো, পৃথিবীর মোট আয়তন ৫১,০০৯৮,৫২০ বর্গকিমি। আর স্থলভাগের আয়তন ১৪,৮৯,৫০,৩২০ বর্গকিমি। আর বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৭৭১ কোটি। ফিলিস্তীনের আয়তন ৬,০২০ কিমি। আর জনসংখ্যা ৫১ লাখ। এতবড় বিশাল পৃথিবীতে এই সামান্য ৫১ লাখ ফিলিস্তীনের কি বাঁচবার অধিকার নাই? জাতিসংঘের কাছে প্রশ্ন— কোন কারণে ভূমিহীন-যাযাবর ইয়াহূদীজাতিকে পরের জায়গায় অন্যায়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হলো? ফিলিস্তীনিদের মাটিতে কেন তাদের ভাগ দেওয়া হলো? এর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে? কারণটা কি তাহলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক, না-কি ধর্মীয়? ঠিক যে কারণে অবৈধভাবে ইয়াহূদীদের প্রতিষ্ঠিত করা হলো, ঐ একই কারণে ফিলিস্তীনিদেরও দিতে হবে তাদের বৈধ স্বাধিকার। দিতে হবে তাদের ন্যায্য স্বাধীনতা। ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে মুসলিমবিশ্বকে। ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে আরববিশ্বকে। স্বজাতির করুণ আর্তনাদে দীপ্ত ও সাহসী হতে হবে। জাতীয় চেতনায় হতে হবে উজ্জীবিত। চাপ প্রয়োগ করতে হবে জাতিসংঘকে। নিশ্চিত করতে হবে স্বাধীন ফিলিস্তীনের। প্রতিষ্ঠিত করতে ফিলিস্তীনিদের নিরাপত্তা। আর এ দায়িত্ব নিতে হবে জাতিসংঘকেই। অংশগ্রহণ থাকতে হবে আরববিশ্বসহ গোটা মুসলিমবিশ্বের। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব

মূল (উর্দূ) : আবু যায়েদ যামীর
*অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান**

(জুন'২১ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৭)

ভুল ধারণা-৭ : আহলেহাদীছদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য উম্মতের মাঝে মতভেদ তৈরি করা :

প্রত্যেক মতভেদ কি নিন্দনীয়? নিশ্চয়ই না, বরং ঐ মতভেদ নিন্দনীয়, যা সত্যের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে করা হয়। হক্কের বিরুদ্ধে মতভেদ করা ভ্রষ্টতা। কিন্তু বাতিল বা অসত্যের বিরোধিতা করা ফরয। ইসলাম কখনো এই শিক্ষা দেয় না যে, সঠিক বিষয়কে বেঠিক আর বেঠিক বিষয়কে সঠিক বলে সাব্যস্ত করতে হবে। যদি এই নীতির অনুসরণ করা হয়, তাহলে সমাজ থেকে اَلنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ তথা অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করার যেই আদেশ রয়েছে, তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে। এর ফলশ্রুতিতে সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্যই সমাজ থেকে উঠে যাবে। সুতরাং ভুল কথার প্রতিরোধ করা জরুরী, চাই তা ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে হোক বা ইলমী ভুলের বিরুদ্ধে হোক।

১. সত্যের বিরোধিতায় যে ইখতেলাফ করা হয়, তা আহলেহাদীছদের নিকট নিন্দনীয় : সত্যের বিরুদ্ধে মতভেদ করা মূলত নিন্দনীয় কাজ। সত্য উন্মোচিত হওয়ার পর তা অস্বীকার করা বা তার বিরোধিতা করা এবং আহলে হক্ব বা সত্যপন্থীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন দল গঠন করা আল্লাহর নিকট শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 'আর তোমারা তাদের মতো হয়ো না, যাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে এবং পরস্পর মতভেদে লিপ্ত হয়েছে; তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি' *(আলে ইমরান, ৩/১০৫)*। এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, নিজেদের মাঝে পরস্পরে মারামারি আর ফাসাদ সৃষ্টিসহ সকল মন্দের মূল শেকড় হচ্ছে- সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরও তার অনুসরণ না করে নিজের জেদের বশীভূত হয়ে তার উপর অটল থাকা। কিন্তু ঐক্যের কথা ভেবে একে অপরের দ্বীনি ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা এবং সংশোধনের পদক্ষেপ না নেওয়া নিশ্চয় ভুল হিসেবে গণ্য হবে। কেননা ঐক্যের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সত্য-মিথ্যা বিচার না করে শুধু ঐক্য গড়ে তোলা; বরং মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল মুসলিমের সত্যের উপর ঐক্যের সেতুবন্ধন তৈরি করা। সুতরাং দলীল দ্বারা প্রমাণিত সত্যের উপর ঐক্য গড়ার স্বার্থে নির্দ্বিধায় সঠিক বিষয়টি বর্ণনা করে দেওয়া আবশ্যক। অন্যথা আলেমগণ তাদের যিম্মাদারী থেকে মুক্ত হতে পারবেন না।

২. উম্মতের মতভেদের যুগে সুন্নাহর অনুসরণেই মুক্তি নিহিত আছে : নবী করীম ﷺ পরবর্তী যুগে উম্মতের মাঝে যে মতভেদ সৃষ্টি হবে, তা পূর্বেই বলে গেছেন। সে সময় তিনি এই কথা বলেননি যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ মতের উপর থেকেই ঐক্য গড়ে তুলবে; বরং তিনি এই মতবিরোধের যুগে তাঁর এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের পথ অনুসরণ করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

'তোমাদের মধ্য হতে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহর অনুসরণ করবে, তোমরা তা শক্তভাবে ধারণ করবে এবং দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! (ধর্মে) প্রতিটি নবাবিষ্কৃত বিষয় হতে। কারণ প্রতিটি নবাবিষ্কৃত বিষয় হলো বিদআত আর প্রতিটি বিদআতের পরিণাম ভ্রষ্টতা'।[১] ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সকল মতবিরোধের মূল শেকড় হচ্ছে- নিজের মতকে দ্বীন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তার উপর বহাল থাকা এবং দ্বীনের মধ্যে নিজের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করা।

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭১৮৫; আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মুসতাদরাকে হাকেম, ছহীহুল জামে', হা/২৫৪৯।

www.al-itisam.com

৩. উম্মতের মতবিরোধের সময় সুন্নাহকে আঁকড়ে থাকা অতি সহজ নয় : পরবর্তী যুগে শত্রুতা এমন ব্যাপক হবে যে, উম্মতের মতবিরোধের সময় এই মতবিরোধকে সমাধান করার জন্য নবী ﷺ-এর সমাধান (কুরআন এবং হাদীছ) এর দিকে প্রত্যাবর্তন করার বিষয়টি একেবারেই থাকবে না। মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মাঝে দল তৈরির গোঁড়ামির চশমা লাগিয়ে সকল সমস্যার সমাধান করার ব্যর্থ চেষ্টা করবে। এই সময় কিতাব এবং সুন্নাহকে অন্য সকল বিষয়ের উপর প্রাধান্য দানকারীদের বড় বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ اخْتِلاَفِ أُمَّتِي كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ 'আমার উম্মতের মতবিরোধের সময় আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধারণ করার অবস্থা হবে হাতে জ্বলন্ত আগুন ধারণকারীর ন্যায় (কঠিন হবে)'।[২]

৪. আহলেহাদীছদের নিকট সত্য বলা আবশ্যক- যদিও তা কঠিন হয় : মানুষের শত্রুতা এবং অসন্তুষ্টির ভয় থেকে বাঁচার জন্য সত্যকে গোপন করে মানুষের নিকট সস্তা প্রসিদ্ধি এবং সাময়িক গ্রহণযোগ্যতা ও নিরাপত্তা অর্জিত হতে পারে, তবে মানুষের সামনে সত্যকে প্রকাশ করার যে আল্লাহর যিম্মাদারী ছিল, তা হতে মুক্ত হতে পারবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন, أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ 'সাবধান! কেউ যখন কোনো সত্য কথা জানবে, তখন তাকে মানুষের ভয় যেন সেই সত্য বলা থেকে বিরত না রাখে'।[৩]

৫. অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা আবশ্যক : আল্লাহর নবী ﷺ পরবর্তী যুগে সত্যপন্থীদের ফযীলত বর্ণনা করেছেন, তারা মানুষকে ভুল পথ থেকে বাধা প্রদান করবে। রাসূল ﷺ বলেন, إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْماً يُعْطَوْنَ مِثْلَ أُجُورِ أَوَّلِهِمْ فَيَنْكِرُونَ الْمُنْكَرَ 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু মানুষ থাকবে, যাদেরকে অগ্রগামী ব্যক্তিদের ন্যায় প্রতিদান দেওয়া হবে। তারা ঐ সমস্ত লোক, যারা অন্যায়ের বিরোধিতা করবে'।[৪] একথা স্পষ্ট যে, মন্দ কর্মে বাধা প্রদান করার ফলে কিছু মানুষ তাদের কথা মানবে আবার কিছু মানুষ মানবে না, যার ফলে মতভেদের সৃষ্টি হবে। কিন্তু শুধু মতভেদের ভয়ে মন্দকে প্রতিহত করা ছেড়ে দেওয়া নবী ﷺ-এর হেদায়াত এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াতী পদ্ধতি বর্জনের শামিল।

৬. দ্বীনের জ্ঞানসমুদ্রকে কল্পকাহিনী, কুসংস্কারের মিশ্রণ হতে পবিত্র করা একান্ত জরুরী : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'প্রত্যেক আগতদের মধ্যে নেক, তাক্বওয়াসম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য মানুষ (কিতাব ও সুন্নাহর) এ জ্ঞান গ্রহণ করবেন। আর তারাই এ জ্ঞানের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনকারীদের রদবদল, বাতিলপন্থীদের মিথ্যা অপবাদ এবং অজ্ঞদের ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে বিদূরিত করবেন'।[৫] এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, দ্বীনকে সকল ধরনের পরিবর্তন এবং অপব্যাখ্যা হতে রক্ষার জন্য ভুলকে প্রতিহত করা জরুরী। নতুবা দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা কুসংস্কার এবং সামাজিক বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ এর কবলে চাপা পড়ে যাবে। আর এজন্যই সর্বদা সত্যপন্থীরা দ্বীনের হেফাযতের এই মহান দায়িত্ব পালন করে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও করে যাবেন। অনুরূপভাবে যে সকল মানুষ পথভ্রষ্ট হওয়ার পরও নিজেকে সত্যপন্থী প্রমাণ করার চেষ্টায় লেগে আছে এবং অতি চটকদার ভাষা ব্যবহার করে উম্মতের অসচেতন মানুষগুলোকে ফুঁসলিয়ে নিজেদের দুনিয়ার জীবন সুন্দর বানানোর (অর্থ কামানোর) মাধ্যম বানিয়েছে, তাদের মুখোশ উন্মোচন করা শুধু হক্কের প্রচার নয়, বরং উম্মতের কল্যাণের জন্য মৌলিক দায়িত্বও বটে।

সুতরাং আহলেহাদীছদের বক্তব্য এবং লেখনির মধ্যে যেখানেই দ্বীনে হক্ব-এর বর্ণনা এবং কল্যাণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়, সেখানেই বাতিল এবং বাতিলপন্থীদের প্রতিহতও করা হয়ে থাকে। এমনকি কোনো জায়গায় কোনো যোগ্য ব্যক্তিরও যদি কোনো বিষয়ে ভুল হয়ে থাকে, তখনও দ্বীনের হেফাযত এবং সত্যকে উন্মোচন করার উদ্দেশ্যে আহলেহাদীছগণ তা বর্ণনা করে দেন। আর এর দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে প্রতিহত করা উদ্দেশ্য হয় না, বরং সত্যকে বর্ণনা করে দেওয়াই উদ্দশ্যে হয়ে থাকে। মূলত আহলেহাদীছদের নিকট সত্যের স্থান কারও ব্যক্তিত্বের অনেক উপরে।

(চলবে)

২. আল-হাকীম ফী নাওয়াদিরিল উছূল; ছহীহুল জামে', হা/৬৬৭৬।
৩. তারমিযী, হা/২১৯১; ইবনু মাজাহ, হা/৪০০৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/১১৮৪২।
৪. ছহীহুল জামে', ২২২৪, হাদীছটি ছহীহ।
৫. বায়হাক্বী; তাহক্বীক্ব মিশকাত, পৃ. ২৪৮, হাদীছটি ছহীহ।

www.al-itisam.com

হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে গরু ও প্রাণীর মাংস খাওয়ার বিধান

-ব্রাদার রাহুল হোসেন (রুহুল আমিন)*

(পর্ব-২)

ঋগবেদে গরু :

ভারতে কয়েকদিন পর পরই গোহত্যা নিয়ে সংহিসতা দেখা দেয়। কিছু দিন আগে বাংলাদেশে এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এজন্য আন্দোলনের হুমকিও দেওয়া হয় এবং এর বিরুদ্ধে নানা বিলও পাশ করানো হয় কিন্তু ভারতে সবসময়ই যে গরু পূজ্য এবং অবধ্য ছিল, এমন নয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, গরুকে শুধু যে যজ্ঞে বলি হিসাবে হত্যা করা হতো তাই নয়, বরং বিশেষ অতিথি, বেদজ্ঞ প্রভৃতিকে আপ্যায়ন করারও জন্যও গোমাংসের ব্যবস্থা করা হতো। এত গুরুত্ব থাকার পরও বৈদিক আর্যরা গোহত্যা করত। বৈদিক দেবতাদের ছিল গোমাংসের প্রতি বিশেষ লোভ।

বৈদিক দেবতা ইন্দ্র গরু খেতে বেশ ভালোবাসতেন। ঋক মন্ত্রে বারবার ইন্দ্রকে গরু ভক্ষণ করতে বলা হয়েছে। ঋগবেদ, ১০/৮৬/১৩-এ বলা হয়েছে—

বৃষাকপায়ি রেবতি সুপুত্র আদু সুস্নুষে । ঘসত্ত ইন্দ্র উক্ষণঃ প্রিয়ং কাচিৎকরং হবির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১০.০৮৬.১৩

‘হে বৃষাকপিবনিতে! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্ট পুত্রযুক্তা এবং আমার সুন্দরী পুত্রবধূ। তোমার বৃষদিগকে ইন্দ্র ভক্ষণ করুন, তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোমদ্রব্য তিনি ভক্ষণ করুন। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ’।[১]

‘Wealthy Vrsakapayi, blest with sons and consorts of thy sons, Indra will eat thy bulls, thy dear oblation that effecteth much. Supreme is Indra over all’.[২]

ঋগবেদ, ১০/২৭/২-এ বলা হয়েছে—

যদীদহং যুধয়ে সংনয়ান্যদেবযূন্তন্বা৩ শূশুজানান্ । অমা তে তুম্রং বৃষভং পচানি তীব্রং সুতং পংচদশং নি ষিংচম্ ॥ ১০.০২৭.০২

‘(ঋষি বলিতেছেন)— যে সকল ব্যক্তি দৈব কর্মের অনুষ্ঠান না করে এবং কেবল তাহাঁদিগের নিজের উদর পূরণ করিয়া স্ফীত হইয়া উঠে, আমি যখন তাহাঁদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাই, তখন, হে ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত পুরোহিতদিগের সহিত একত্র স্থূলকায় বৃষকে পাক করি এবং পঞ্চদশ তিথির প্রত্যেক তিথিতে সোমরস প্রস্তুত করিয়া থাকি’।[৩]

‘Then Will I, when I lead my friends to battle against the radiant persons of the godless, Prepare for thee at home a vigorous bullock, and pour for thee the fifteen-fold strong juices’.[৪]

ঋগবেদ, ১০/২৮/৩-এ ঋষি বলছেন—

অদ্রিণা তে মন্দিন ইন্দ্র তূয়ান্সুন্বন্তি সোমান্পিবসি ত্বমেষাম্ । পচন্তি তে বৃষভাঁ অত্সি তেষাং পৃক্ষেণ যন্মঘবন্হূয়মানঃ ॥ ১০.০২৮.০৩

‘হে ইন্দ্র! যখন অন্ন কামনাতে তোমার উদ্দেশ্যে হোম করা হয়, তখন তাহারা শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তরফলক সহযোগে মাদকতাশক্তিযুক্ত সোমরস প্রস্তুত করে, তুমি তাহা পান করো। তাহারা বৃষভসমূহ পাক করে, তুমি তাহা ভোজন করো’।[৫]

‘Men with the stone press out for thee, O Indra, strong, gladdening Soma, and thereof thou drinkest. Bulls they dress for thee, and of these thou eatest when, Maghavan, with food thou art invited’.[৬]

ইন্দ্র নিজেও তার জন্য পনের অথবা বিশটি বৃষ পাক করে দেওয়ার জন্য বলেছেন। এইসব বৃষ খেয়ে ইন্দ্র তার শরীরকে স্থূল করতে চান, উদরকে পূর্ণ করতে চান—

উক্ষণো হি মে পংচদশ সাকং পচন্তি বিংশতিম্ । উতাহমংি পীব ইদুভা কুক্ষী পৃণন্তি মে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১০.০৮৬.১৪

---

* মুর্শিদাবাদ, ভারত।

১. ঋগবেদ, ১০/৮৬/১৩।

২. Rigveda, 10/86/13, Translated by Griffith.

৩. ঋগবেদ, ১০/২৭/২।

৪. Rigveda, 10/27/2, Translated by Griffith.

৫. ঋগবেদ, ১০/২৮/৩।

৬. Rigveda, 10/28/3, Translated by Griffith.

www.al-itisam.com

‘আমার জন্য পঞ্চদশ এমন কি বিংশ বৃষ পাক করিয়া দেয়। আমি খাইয়া শরীরের স্থূলতা সম্পাদন করি, আমার উদরের দু’পার্শ্ব পূর্ণ হয়, ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ’।[৭]

‘Fifteen in number, then, for me a score of bullocks they prepare, And I devour the fat thereof: they fill my belly full with food. Supreme is Indra over all’.[৮]

ঋগবেদ, ৬/৩৯/১-এ ঋষি গোপ্রমুখ অন্নের জন্য প্রার্থনা করেছেন—

মন্দ্রস্য কবের্দিব্যস্য বহ্নের্বিপ্রমন্মনো বচনস্য মধ্বঃ | অপা নস্তস্য সচনস্য দেবেষো যুবস্ব গর্ণতে গোগ্রাঃ ||

‘হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের সেই সোমরস পান করো। ইহা মদকর, বিক্রান্ত, স্বর্গীয়, প্রাজ্ঞসম্মত, ফলোপধায়ক, সুপ্রসিদ্ধ ও সেবনীয়। হে দেব, তুমি আমাদিগকে গো প্রমুখ অন্ন দান করো’।[৯]

অগ্নির উদ্দেশ্যে ঋগবেদ, ৬/১৬/৪৭-এ বলা হয়েছে—

আ তেঁ অগ্ন ক্রুচা হুবির্হৃদা তষ্টং ভরামসি । তে তেঁ ভবন্তূক্ষণঁ ঋষভাসোঁ বশা উত ॥ ৬.০১৬.৪৭

‘হে অগ্নি! আমরা তোমাকে হৃদয় দ্বারা সংস্কৃত ঋক রূপ হব্য প্রদান করিতেছি। বলশালী বৃষভ ও ধেনুগণ তোমার নিকট পূর্বোক্ত রূপ হব্য হউক’।[১০]

‘Agni, we bring thee, with our hymn, oblation fashioned in the heart. Let these be oxen unto thee, let these be bulls and kine to thee’.[১১]

১০ম মণ্ডলে অগ্নিতে ঘোড়া, বৃষ, মেষকে আহুতি দিতে দেখা যায়—

যস্মিন্নশ্বাঁস ঋষভাসঁ উক্ষণো বশা মেষা অবসৃষ্টাস আহুতাঃ । কীলালপে সোমপৃষ্ঠায় বেধসেঁ হৃদা মতিং জনয়ে চারুমগ্নয়েঁ ॥ ১০.০৯১.১৪

‘যে অগ্নির উপরও বিস্তর ঘোটক, বলবান বৃষ, পুরুষত্ববিহীন মেষ আহুতিরূপে অর্পণ করা হইয়াছে, যিনি জলের পালনকর্তা, যাহার পৃষ্ঠে সোমরস, যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সেই অগ্নির উদ্দেশ্যে মনে মনে চিন্তা করিয়া এই সুন্দর স্তব রচনা করিয়াছি’।[১২]

‘He in whom horses, bulls, oxen, and barren cows, and rams, when duly set apart, are offered up,—To Agni, Soma-sprinkled, drinker of sweet juice, Disposer, with my heart I bring a fair hymn forth’.[১৩]

৮ম মণ্ডলে অগ্নিকে গোখাদক বলা হয়েছে—

উক্ষান্নায় বশান্নায় সোমপৃষ্ঠায় বেধসেঁ । স্তোমৈর্বিধেমাগ্নয়েঁ ॥ ৮.০৪৩.১১

‘Let us serve Agni with our hymns, Disposer, fed on ox and cow, Who bears the Soma on his back’.[১৪]

ঋগবেদের বিবাহ সুক্তে দেখা যায়, বিবাহের সময় বৃষ হত্যা করা হতো—

সূর্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎসবিতা যমবাসৃজৎ । অঘাসু হন্যন্তে গাবোঽর্জুন্যোঃ পর্যুহ্যতে ॥ ১০.০৮৫.১৩

‘The bridal pomp of Sūrya, which Savitar started, moved along. In Magha days are oxen slain, in Arjuris they wed the bride’.[১৫]

রমেশচন্দ্র দত্ত অবশ্য এর অন্যরকম অনুবাদ করেছেন—

‘পতিগৃহে গমনকালে সূর্য্য সূর্য্যাকে যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহা অগ্রে অগ্রে চলিল। মঘা নক্ষত্রের উদয় এই উপঢৌকনের, অঙ্গভুত গাভীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, অর্জনী, অর্থাৎ ফাল্গুণী নামক দুই নক্ষত্রের উদয় কালে সেই উপঢৌকন বহিয়া লইয়া যায়’।[১৬]

[প্রবন্ধটির বাকী অংশ ২৭ নং পৃষ্ঠায়]

৭. ঋগবেদ, ১০/৮৬/১৪।
৮. Rigveda, 10/86/14, Translated by Griffith.
৯. ঋগবেদ, ৬/৩৯/১।
১০. ঋগবেদ, ৬/১৬/৪৭।
১১. Rigveda, 6/16/47, Translated by Griffith.
১২. ঋগবেদ, ১০/৯১/১৪।
১৩. Rigveda, 10/91/14, Translated by Griffith.
১৪. Rigveda, 8/43/11, Translated by Grifiith.
১৫. Rigveda, 10/85/13, Translated by Grifiith.
১৬. ঋগবেদ, ১০/৮৫/১৩।

www.al-itisam.com

বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি

-সাঈদুর রহমান*

ধরুন আপনি কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়েছেন। বছরের শুরুতে প্রতিষ্ঠানের মালিক ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমার প্রতিষ্ঠানে একজন ম্যানেজার নিয়োগ দিয়েছি। যে ব্যক্তি তার কথা শুনে তাকে মান্য করবে, সে প্রকারান্তরে আমার কথাই মান্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার কথা শুনবে, তাকে চাকরিতে স্থায়ী করা হবে, বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে, তাকে পরিপূর্ণ বেতন-ভাতা দেওয়া হবে ও বছর শেষে বেতনের সাথে সাথে বোনাসও দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার কথা শুনবে না; বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে ও তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। ধরুন, আল্লাহ তাআলা ইসলাম নামক প্রতিষ্ঠানে মুহাম্মাদ ﷺ-কে একজন ম্যানেজার হিসেবে মনোনীত করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁকে ভালোবাসবে ও তাঁর কথার অনুসরণ করবে, সে প্রকারান্তরে আল্লাহকেই ভালোবাসল ও তাঁরই কথাকে অনুসরণ করল। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ‘(হে নবী!) বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো। তিনিও তোমাদের ভালোবাসবেন ও তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু’ *(আলে ইমরান, ৩/৩১)*।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসবে তিনি তাকে চিরশান্তির নিবাস জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তারাই সফলকাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

‘তিনি তাদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর তারা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট; তারাই তো আল্লাহর দল আর আল্লাহর দল অবশ্যই সফলকাম হবে’ *(আল-মুজাদালা, ৫৮/২২)*। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাঁকে অস্বীকার করবে ও তাঁর কথার বিরুদ্ধাচরণ করবে, তার জন্য রয়েছে ইহকাল ও পরকালে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। পরকালে তো তার শাস্তি হবেই, ইহকালেও কিঞ্চিৎ হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ‘আমরা অবশ্যই তাদেরকে বড় শাস্তি দেওয়ার পূর্বে ছোট শাস্তি দিয়ে থাকি, যাতে তারা ফিরে আসে’ *(আস-সাজদাহ, ৩২/২১)*।

পৃথিবীতে মানুষের জীবনে যে সমস্ত কারণে শাস্তি আসে, তার মধ্যে অন্যতম হলো নবী-রাসূলগণ আলাইহিস সালাম-এর ‘বিরুদ্ধাচরণ’। বিরুদ্ধাচরণের অর্থ হলো, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আদেশ বা নিষেধ করেছেন, তা মান্য না করে উল্টোটা করা। কেউ যদি আল্লাহর সাথে বেয়াদবী করে বা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে তিনি তাকে সাথে সাথে শাস্তি দেন না, বরং কিছুকাল অবকাশ দেন। যেমন- আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ‘আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিতেন, তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোনো জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা মুহূর্তকাল আগাতে বা পিছাতে পারবে না’ *(আন-নাহল, ১৬/৬১)*। কিন্তু কেউ যদি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে তার শাস্তি অবধারিত। আমরা যদি শাস্তিপ্রাপ্ত পূর্ববর্তী জাতির প্রতি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই যে, তাদের কাছে শাস্তি আসার প্রধান কারণ হলো, রাসূল আলাইহিস সালাম-দের বিরুদ্ধাচরণ। ফেরাউন যখন নিজেকে বড় প্রভু বলে দাবি করেছিল, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে সাথে সাথে শাস্তি দেননি, বরং অবকাশ দিয়েছিলেন। কিন্তু যখনই সে মূসা আলাইহিস সালাম-এর বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁকে হত্যা করতে গেল, তখনই তাকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করলেন। এমনিভাবে আদ জাতি যখনই হূদ আলাইহিস সালাম-এর বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলো, তখনই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাত রাত আট দিন ধারাবাহিক ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা পাকড়াও করলেন। ছামূদ জাতি যখনই উষ্ট্রীর পা কেটে দিয়ে ছালেহ আলাইহিস সালাম-কে হত্যা করার পরিকল্পনা করছিল, তখনই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

আমরা বুঝতে পারলাম যে, যুগে যুগে মানুষের নিকট শাস্তি আসার অন্যতম কারণ হলো রাসূল আলাইহিস সালাম-দের বিরুদ্ধাচরণ। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে দুনিয়াতে কী পরিণতি হয়েছিল নিম্নের হাদীছগুলোর প্রতি একটু নযর দেওয়া যাক-

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

www.al-itisam.com

সালামা ইবনু আক্বওয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ لاَ اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ 'এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বাম হাতে খাদ্য গ্রহণ করছিল। তিনি বললেন, 'তুমি তোমার ডান হাতে খাও'। সে বলল, আমি পারব না। তিনি বললেন, 'তুমি যেন না-ই পার'। শুধু অহমিকাই তাকে বারণ করছে। সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সে আর কখনো তার ডান হাত মুখের নিকট উঠাতে পারেনি'।[১]

উক্ত হাদীছের প্রতি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা অমান্য করার কারণে ঐ ব্যক্তির হাত সারা জীবনের জন্য অকেজো হয়ে গেছে। বর্তমানেও এমন অনেক লোক আছে, যারা বাম হাতে চা, কফি ও পানি জাতীয় খাদ্য পান করে থাকে। যদি তাদের ডান হাতে পান করার জন্য বলা হয়, তাহলে ইসলাম নিয়ে কটূক্তি শুরু করে দেয়। তাদের এই হাদীছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা ও সাবধান হওয়া উচিত, অন্যথা তাদের পরিণতি খুবই ভয়াবহ হতে পারে। অনেক মানুষ আছে, যারা ইসলামের বিধি-বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ছালাত পড়তে বললে বলে, মৃত্যুর পর কী হবে দেখা যাবে, পর্দা করতে বললে ইসলাম নিয়ে অযাচিত কথা বলে, কবরের শাস্তির কথা বললে বলে, যা চোখে দেখি তা বিশ্বাস করি আর যা দেখি না, তা বিশ্বাস করি না; কবরের শাস্তি যেহেতু দেখা যায় না, সেহেতু আমরা তা বিশ্বাস করি না। শুধু কী তাই, অবান্তর কথা বলে এসব বিধানকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে চলে যায়। এমনকি কিছু মানুষকে বলতে শোনা যায়, পরকালে তারা এসব বিষয় নিয়ে আল্লাহর সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে। আমাদের এসব বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত; তা না হলে ইহজগতেই আমাদেরকে এর প্রতিফল ভোগ করতে হতে পারে। টাকা-পয়সা, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন নিয়ে আমাদেরকে বিষণ্নতায় কালাতিপাত করতে হবে, মনের মাঝে তৃপ্তি পাব না, সবসময় হতাশাগ্রস্ত থাকতে হবে এবং মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও মনের অজান্তে আমরা কাফেরে পরিণত হবো। কারণ আমরা ইসলামের বিধান নিয়ে হাসি-তামাশা করেছি। আর কেউ যদি ইসলামের কোনো বিধান নিয়ে মজা-তামাশা করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যায়। দেখুন, আল্লাহ তাআলা কী বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾

'যদি তাদের জিজ্ঞেস করো তাহলে তারা বলবে, আমরা তো খেল-তামাশা করেছি মাত্র। বলো, আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে তোমরা বিদ্রূপ করছ? আজকে আর ওযর-আপত্তি উত্থাপন করবে না। তোমরা তো ঈমান আনার পরও কাফেরে পরিণত হয়েছ। আমরা যদি তোমাদের একটি দলকে ক্ষমা করি, তাহলে অপর দলকে শাস্তি দিয়ে থাকি, এর কারণ হলো তারা অপরাধী' *(আত-তওবা, ৯/৬৬)*।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি হাদীছে অনুরূপ কথা বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'রাতের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের ন্যায় বিপর্যয় আগমনের পূর্বেই তোমরা সৎকাজের প্রতি অগ্রসর হও। ঐ সময় যে ব্যক্তি সকাল বেলায় মুমিন থাকবে, সে সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় মুমিন থাকবে, সে সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়াবী (সামান্য) স্বার্থের বিনিময়ে মানুষ তার ধর্ম বিক্রয় করে দিবে'।[২] সুধী পাঠক! তাই আমাদেরকে খুবই সাবধানতা ও সতর্কতার সাথে কথা বলতে হবে। কারণ মনের অজান্তে অসঙ্গতিপূর্ণ কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে, যার পরিণতি হবে জাহান্নাম।

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلاَ يَقُومَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّئٍ.

আবূ হুমাইদ আস-সা'এদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন তাবূকে আসলাম, তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'সাবধান! আজ রাতে প্রবল ঝড় প্রবাহিত হবে। কাজেই কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে এবং প্রত্যেকেই যেন তার উট বেঁধে রাখে'। তখন আমরা নিজ নিজ উট বেঁধে নিলাম। প্রবল ঝড় হতে লাগল। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলে ঝড় তাকে 'ত্বয়' নামক পর্বতে নিক্ষেপ করল।[৩] এই হাদীছের টিকায় ইবনে বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'ঝঞ্ঝাবায়ু ঐ ছাহাবীকে ছয়শ কিলোমিটার দূরে নিক্ষেপ করে'।[৪] দেখুন, ছাহাবী নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা অমান্য করার জন্য দাঁড়াননি, বরং মনের অজান্তেই ভুল করে দাঁড়িয়েছিলেন; তথাপিও তার উপর শাস্তি আপতিত হয়। একটু

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২০২১।

২. তিরমিযী, হা/২১৯৫, হাসান ছহীহ।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/ ১৪৮১।

৪. প্রাগুক্ত।

www.al-itisam.com

ভেবে দেখুন, যারা জেনেশুনে নবী ﷺ-এর কথা অমান্য করে, তাদের পরিণতি কেমন হবে?

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مَرَّةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ فَرَاعِنَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ اذْهَبْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَعْتَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَذَهَبَ إِلَيْهِ قَالَ يَدْعُوكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَنْ رَسُولُ اللهِ وَمَا اللَّهُ مِنْ ذَهَبٍ هُوَ أَمْ مِنْ فِضَّةٍ هُوَ أَمْ مِنْ نُحَاسٍ هُوَ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَخْبَرْتُكَ إِنَّهُ أَعْتَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَقُلْ لَهُ مِثْلَهَا أَرَاهُ فَذَهَبَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَهَا فَرَجَعَ إِلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ أَعْتَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَادْعُهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْكَلَامَ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَحَابَةً حِيَالَ رَأْسِهِ فَرَعَدَتْ فَوَقَعَتْ مِنْهَا صَاعِقَةٌ فَذَهَبَتْ تَقْذِفُ رَأْسَهُ.

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে আরবের কোনো এক অহংকারী লোকের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি (আল্লাহর রাসূল ﷺ) বললেন, তুমি যাও, তাকে আমার নিকট ডেকে আনো। তিনি (জনৈক ছাহাবী) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে এর চাইতেও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি (আবার) বললেন, যাও, তাকে আমার নিকট ডেকে আনো। তিনি (সেখানে) গিয়ে বললেন, রাসূল ﷺ তোমাকে ডেকেছেন। ঐ ব্যক্তি তাকে বলল, আল্লাহ ও রাসূল আবার কে? স্বর্ণের, না-কি রূপার, না-কি তামার? তারপর সে রাসূল ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে সংবাদ দিচ্ছি যে, সে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে এই এই কথা বলেছে। তখন তিনি তাকে বললেন, দ্বিতীয়বার যাও, তাকে গিয়ে আগের মতোই বলো, আমি তাকে দেখতে চাই। অতপর সে গেল এবং ঐ ব্যক্তি তাকে একই কথা বলল। সে ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে সংবাদ দিচ্ছি যে, সে (আগের বারের চাইতে আরও বেশি) ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। তারপর তিনি বললেন, যাও, তাকে আসতে বলো। সে তৃতীয়বার তার কাছে গিয়ে বলল, আর ওই ব্যক্তি ওই কথাই পুনরাবৃত্ত করল। এভাবেই সে কথা বলছিল; এমন সময় আল্লাহ তাআলা তার মাথার সামনে এক খণ্ড মেঘমালা প্রেরণ করেন। আর বিদুৎ চমকে উঠল এবং সেখান থেকে একটি বজ্র পড়ে তার মাথার খুলি উড়ে গেল।[৫]

সম্মানিত দ্বীনি ভাই-বোন! লক্ষ্য করুন, হাদীছে বর্ণিত লোকটিকে কী লোমহর্ষক শাস্তি দেওয়া হয়েছে; তারপরও কি আমরা রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করা পরিত্যাগ করব না? আপনার সাথে বা পাশে যে সহকর্মী বা সহপাঠী আছে, যে পাঁচওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, নিজ জীবনে নবী ﷺ-এর আদর্শ বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। তার সময়ও কিন্তু ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে আর আপনার সময়ও কিন্তু ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। সেও কিন্তু নিজ কাজ ঠিকঠাক আঞ্জাম দিচ্ছে আর আপনিও দিচ্ছেন। আপনার সহকর্মী বা সহপাঠী নিয়মিত ছালাত আদায় করার কারণে কিন্তু তার ইহলৌকিক কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, আর আপনারও হচ্ছে না; কিন্তু তার পরকাল হবে সুখময়, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও আরামদায়ক। আপনার কী অবস্থা হবে তা একটু কল্পনা করে দেখেছেন? আপনার কি মনে চায় না এমন এক উদ্যানে বিচরণ করতে, সেখানে থাকবে অনিন্দ্য সুন্দর পুষ্পকানন, থাকবে না কোনো প্রকার হৈ-হুল্লোড়, থাকবে না সূর্যের প্রখর তাপ, চারপাশে থাকবে শুধু হিমশীতল বাতাস আর বাতাস। ঐ উদ্যানে প্রিয়তমা সঙ্গিনীকে নিয়ে প্রেমালাপ করা কত যে আনন্দদায়ক, তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না! আপনি যদি এই অপরূপ সৌন্দর্যপূর্ণ উদ্যানে যেতে চান, তাহলে নবী ﷺ-এর আদর্শকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করুন। একটা কথা মনে রাখবেন, আপনি যদি রাসূল ﷺ-এর বিরোধিতা করেন. এতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু আপনার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আপনি জানেন কি, জাহান্নাম কেমন? চারদিকে অমাবস্যার ন্যায় ঘোর অন্ধকার। বিকট আওয়াজ, যেন কর্ণ নিস্তেজ হওয়ার উপক্রম। নেই কোনো প্রকার আলো-বাতাস, আরাম-আয়েশ করার মতো কোনো বস্তু; আছে শুধু নাড়ি-ভুঁড়ি বিগলিত করার জন্য ফুটন্ত পানি, গলায় আটকে যায় দুর্গন্ধযুক্ত এমন ফল, পচা রক্ত-পুঁজের পানীয় ও চর্ম দগ্ধ করার জন্য প্রচণ্ড ও প্রখর অগ্নি। সহ্য করতে পারবেন কি ঐ যন্ত্রণা? না পারলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে চলে আসুন। মনে রাখবেন, ইসলাম কিন্তু বিজয়ী হবেই। এতে আপনি অন্তর্ভুক্ত হৌন আর নাই হৌন। আপনাকে নিয়ে আপনি ভেবে দেখুন কোন দলে থাকবেন।

পরিশেষে একটি আয়াত উল্লেখ করে লেখার ইতি টানছি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ - هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ ‘তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলোকে নির্বাপিত করতে চায়, আর আল্লাহ তাঁর আলোকে অবশ্যই পরিপূর্ণ করবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। তিনি ওই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে সঠিক পথ ও বিশুদ্ধ দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, সকল দ্বীনকে পরাভূত করার জন্য; যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে’ *(আছ-ছফ, ৬১/৮-৯)*।

৫. তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা রা‘দ।

www.al-itisam.com

আশূরার ছিয়াম

-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন*

আরবী বছরের প্রথম মাস মুহাররম। আরবরা এ মাসকে ‘ছফরুল আউয়াল’ তথা প্রথম ছফর নামকরণ করে নিজেদের ইচ্ছামতো যুদ্ধ-বিগ্রহসহ বিভিন্ন কাজকে হালাল ও হারাম করত। অবশেষে আল্লাহ তাআলা এ অবস্থাকে নিষিদ্ধ করে এ মাসের ইসলামী নামকরণ করেন ‘শাহরুল্লাহিল মুহাররম’ তথা মুহাররম আল্লাহর মাস বলে ঘোষণা করেন। এ মাসের ১০ তারিখ আশূরা বলে পরিচিত। নিঃসন্দেহে আশূরার দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার দিন।

আশূরা কী?

আশূরা শব্দটির বিশ্লেষণ নিয়ে ভাষাবিদগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশের নিকট মুহাররম মাসের দশম তারিখই আশূরার দিন। এটা আরবী শব্দ (عشر) আশারা হতে নির্গত, যার অর্থ হলো দশ। অতএব, মুহাররম মাসের দশম তারিখে ছিয়াম রাখার নামই হলো আশূরার ছিয়াম।[১]

আশূরার ছিয়ামের প্রেক্ষাপট :

মহান আল্লাহর শুকরিয়াস্বরূপ এই দিনে ছিয়াম রাখা হয়। কারণ, আল্লাহ পাক এই দিনে তাঁর নবী মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর ক্বওমকে ফেরাউন ও তার দলবল থেকে রক্ষা করেছিলেন। হাদীছে এসেছে—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالُوْا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسٰى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় এসে ইয়াহূদীদের দেখলেন, তারা আশূরার ছিয়াম পালন করছে। তিনি বললেন, এটা কী? তারা বলল, এটা একটা ভালো দিন, এটা এমন এক দিন, যেদিন আল্লাহ বনূ ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সুতরাং মূসা (আলাইহিস সালাম) এই দিন ছিয়াম পালন করেছেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের চেয়ে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে অধিক হক্বদার। এরপর তিনি নিজে ছিয়াম পালন করলেন এবং সকলকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন।[২]

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এ হাদীছটির বর্ধিত অংশে বলা হয়েছে যে, আশূরা এমন একটি দিন, যে দিনে নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কিশতী জুদী পর্বতে অবতরণ করে। ফলে তিনি শুকরিয়াস্বরূপ এ দিনটিতে ছিয়াম রাখেন। অতএব, প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী নবী ও উম্মতের মাঝেও আশূরায়ে মুহাররমে ছিয়াম রাখার ইবাদত চালু ছিল।

আশূরার ছিয়ামের হুকুম :

ইসলামের পূর্বযুগ হতেই এ ছিয়ামের প্রচলন রয়েছে। অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে তা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পর এটা সকলের ঐকমত্যে সুন্নাত। কিন্তু রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে তার হুকুম সম্পর্কে বিদ্বানগণ ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ ওয়াজিব বলেছেন, আবার কেউ সুন্নাত বলেছেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে এ ছিয়াম রেখেছেন এবং ছাহাবীদের রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীছে এসেছে—

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কুরায়শরা জাহেলী যুগে আশূরার দিন ছিয়াম পালন করত। জাহেলী যুগে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও এ দিনে ছিয়াম রাখতেন। তিনি যখন মদীনায় আসেন, তখনো (প্রথমত) তিনি এ ছিয়াম পালন করেছেন এবং তা রাখার হুকুমও দিয়েছেন। কিন্তু যখন রামাযানের ছিয়াম ফরয হয়, তখন তিনি আশূরার ছিয়াম ছেড়ে দেন। অতঃপর যার ইচ্ছা সে তা রাখত আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।[৩]

আশূরার ছিয়ামের ফযীলত :

আশূরার ছিয়াম বড় ফযীলতপূর্ণ। কেননা হাদীছে এসেছে—

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.

মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) যে বছর হজ্জ করেছিলেন, সে বছর হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান তাকে

---

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. মিরআতুল মাফাতীহ, ৭/৪৫।

২. ছহীহ বুখারী, হা/২০০৪।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/২০০২।

www.al-itisam.com

আশূরার দিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এটি আশূরার দিন। আল্লাহ তোমাদের উপর এ দিন ছিয়াম রাখা ফরয করেননি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। তাই যার ইচ্ছা, সে তা পালন করুক আর যার ইচ্ছা সে তা পালন না করুক।[৪]

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ وَلاَ شَهْرًا إِلاَّ هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ.

উবায়দুল্লাহ ইবনে আবূ ইয়াযীদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে আশূরার দিনে ছওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, এ দিন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো দিনকে অন্য দিনের তুলনায় উত্তম মনে করে সেদিনে ছওম পালন করেছেন বলে আমার জানা নেই। অনুরূপভাবে রামাযান ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো মাসকে অন্য মাসের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে ছওম পালন করেছেন বলেও আমার জানা নেই।[৫]

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার দিনে ছিয়াম পালন করার নির্দেশ দিতেন। যখন রামাযানের ছিয়াম ফরয করা হলো, তখন যার ইচ্ছা সে আশূরার দিনে ছওম পালন করত, আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।[৬]

আশূরার ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে আরও বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ.

সালামা ইবনুল আকওয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ আসলাম সম্প্রদায়ের এক লোককে আদেশ করেছেন, সে যেন জনগণের মধ্যে প্রচার করে দেয়, যে ব্যক্তি কিছু খেয়ে ফেলেছে, সে যেন অবশিষ্ট দিন ছিয়াম পালন করে। আর যে (এখনো) কিছু খায়নি, সে যেন ছিয়াম পালন করে। কারণ, আজ হলো আশূরার দিন।[৭]

আশূরার ছিয়ামের সংখ্যা :

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে—

عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﷺ يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আশূরার দিন ছিয়াম পালন করেন এবং লোকদেরকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন, তখন ছাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! ইয়াহূদ এবং নাছারা এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইনশা-আল্লাহ আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও ছিয়াম পালন করব। বর্ণনাকারী বলেন, এখনো আগামী বছর আসেনি, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু হয়ে যায়।[৮]

অতএব, দশম তারিখের আগে একদিন অথবা পরে একদিন যোগ করে দু'দিন ছিয়াম রাখা হলো উত্তম। নবী করীম ﷺ বলেন, صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا 'তোমরা আশূরার ছিয়াম রাখো, ইয়াহূদ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করো এবং দশম তারিখের আগে এক দিন অথবা পরে এক দিন মিলিয়ে ছিয়াম রাখো'।[৯]

আশূরার ছিয়াম কোন ধরনের পাপের জন্য কাফফারা?

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আশূরার ছিয়াম সকল ছাগীরা গুনাহের কাফফারা। অর্থাৎ এ ছিয়ামের কারণে মহান আল্লাহ কাবীরা নয়, বরং (পূর্ববর্তী এক বছরের) যাবতীয় ছাগীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। এরপর তিনি বলেন, আরাফার ছিয়াম দুই বছরের (গুনাহের জন্য) কাফফারা, আশূরার ছিয়াম এক বছরের জন্য কাফফারা, যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। হাদীছে বর্ণিত এসব গুনাহ মাফের অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তির আমলনামায় যদি ছাগীরা গুনাহ থেকে থাকে, তাহলে এসব আমল তার গুনাহের

৪. ছহীহ বুখারী, হা/২০০৩।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩২।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১১২৫।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/২০০৭।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৪।
৯. বায়হাক্বী, সুনানে কুবরা, হা/৮৪০৬, সনদ ছহীহ।

www.al-itisam.com

কাফফারা হবে অর্থাৎ আল্লাহ তার ছাগীরা গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি ছাগীরা-কাবীরা কোনো গুনাহই না থাকে, তাহলে এসব আমলের কারণে তাকে ছওয়াব দান করা হবে, তার মর্যাদা উচ্চ করা হবে। আর আমলনামায় যদি শুধু কাবীরা গুনাহ থাকে, ছাগীরা না থাকে, তাহলে আমরা আশা করতে পারি, এসব আমলের কারণে তার কাবীরা গুনাহসমূহ হালকা করা হবে।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পবিত্রতা অর্জন, ছালাত, রামাযান, আরাফা ও আশূরার ছিয়াম ইত্যাদি কেবল ছাগীরা গুনাহসমূহের কাফফারা অর্থাৎ এসব আমলের কারণে কেবল ছাগীরা গুনাহ ক্ষমা করা হয়।[১০]

আশূরার ছিয়াম কি হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে কেন্দ্র করে?

আশূরা উপলক্ষ্যে যে ছিয়াম পালনের বিধান, সেটি ফেরাউনের কবল থেকে মূসা আলাইহিস সালাম-এর নাজাতের শুকরিয়া হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। এর সাথে হুসাইন ইবনু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে। তবে ইসলামী শরীআতে কারবালার ঘটনার সাথে আশূরার ছিয়ামের কোনো সম্পর্ক নেই।

১০. আল-ফাতাওয়াল কুবরা, ৫/৩৪৪।

শাহাদাতে হুসাইনের নিয়্যতে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ, কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহীর আগমন বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের দেশে আশূরায়ে মুহাররমকে শোকের মাস হিসেবে পালনের রেওয়াজ রয়েছে। আর এর কারণ হলো হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কারবালা প্রান্তরে শাহাদাতবরণের মর্মান্তিক ঘটনা। কারবালার সেই ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয় বিদারক, মর্মান্তিক ও ইসলামের ইতিহাসে জঘন্যতম ঘটনার একটি। এই ঘটনা তথা ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জানা-শোনা, বর্ণনা করা ও শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারবালার ঘটনার স্মরণ করে কোনো কিছু বাড়াবাড়ি করা, শীআদের ন্যায় বুক চাপড়ানো, লাঠি-তীর-বল্লম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া, শোকের মাতম করা, হক্ব ও বাতিলের লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করা, হুসাইনের নামে পাউরুটি বানিয়ে বরকতের পিঠা বলে বিক্রয় করা, কালো পোশাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ‘ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে’।[১১]

১১. ছহীহ বুখারী, হা/১২৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩; মিশকাত, হা/১৭২৫।

‘হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে গরু ও প্রাণীর মাংস খাওয়ার বিধান’- প্রবন্ধটির বাকী অংশ

ঋগবেদ, ১০/৭৯/৬-এ গরুকে খণ্ড খণ্ড করে কাটার কথা বলা আছে—

कि देवेषु तयज एनश्चकर्थाग्ने पर्छामि नु तवामविद्वान|अक्रीळन करीळन हरिरत्तवे.अदन वि पर्वशश्चकर्त गामिवासिः ‖

‘হে অগ্নি! তুমি কি দেবতাদের মধ্যে কোনো অপরাধ পাইয়া ক্রোধ ধারণ করিয়াছ? আমি জানি না, এজন্য তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছি? যেমন খড়্গ দ্বারা কোনো গাভীকে খণ্ড খণ্ড করে ছেদন করে সেরূপ তুমি ক্রীড়া কর আর না কর, তুমি উজ্জ্বল হইয়া তোমার আহারীয়দ্রব্য ভোজনকালে পর্বে পর্বে কর্তন কর’ *(ঋগবেদ, ১০/৭৯/৬)*।

মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় মৃতকে গোচর্ম দ্বারা ঢেকে দেওয়া হতো—

अ॒ग्नेर्वर्म॒ परि॒ गोभि॑र्व्ययस्व॒ सं प्रोर्णु॑ष्व॒ पीव॑सा॒ मेद॑सा च । नेत्त्वा॑ धृ॒ष्णुर्हर॑सा॒ जर्हृ॑षाणो द॒धृग्वि॑ध॒क्ष्यन्प॑र्य॒ङ्खया॑ते ॥ १०.०१६.०७

‘হে মৃত! তুমি গোচর্মের সাথে অগ্নি শিখাস্বরূপ কবচ ধারণ করো, তোমার প্রচুর মেদের দ্বারা তুমি আচ্ছাদিত হও, তা হলে এ যে দুর্ধর্ষ অগ্নি, যিনি বলপূর্বক ও অহংকারের সাথে তোমাকে দগ্ধ করতে উদ্যত হয়েছেন, তিনি একেবারে তোমার সর্বাংশে ব্যপ্ত হতে পারবেন না’ *(ঋগবেদ, ১০/১৬/৭)*।

গোহত্যা এত বিপুল পরিমাণে হতো যে, গোহত্যার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল। তাই ঋগবেদ, ১০/৮৯/১৪-এ বলা হয়েছে—

कर्हि॑ स्वि॒त्सा त॑ इन्द्र चे॒त्यास॑द॒घस्य॒ यद्भि॒नदो॒ रक्ष॒ एष॑त् । मि॒त्र॒क्रुवो॒ यच्छस॑ने॒ न गाव॑: पृथि॒व्या आ॒पृग॑मु॒या शय॑न्ते ॥ १०.०८९.१४

‘হে ইন্দ্র! যে অস্ত্র ক্ষেপণ করিয়া পাপাত্মা রাক্ষসকে বিদীর্ণ করিলে, তোমার সেই নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র কোথায় রহিল? যেরূপ গোহত্যাস্থানে গাভীগণ হত হয়, তদ্রুপ তোমার ওই অস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়া বন্ধুদ্বেষী রাক্ষসগণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া শয়ন করে’ *(ঋগবেদ, ১০/৮৯/১৪)*।

Where was the vengeful dart when thou, O Indra, clavest the demon ever beat on outrage? When fiends lay there upon the ground extended like cattle in the place of immolation? *(Rigveda, 10/89/14, Translated by Griffith).*

(চলবে)

সময় ও ঋতু পরিবর্তনের মূল রহস্য

[১৫ যুলক্বা'দা, ১৪৪২ হি. মোতাবেক ২৫ জুন, ২০২১। মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-বাঈজান (হাফি.)****। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক ও 'আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ'-এর গবেষণা সহকারী* ***শায়খ মুরসালীন বিন আব্দুর রউফ।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই গুণকীর্তন ও সহযোগিতা কামনা করি এবং আশ্রয় চাই আমাদের অন্তরের অনিষ্ট হতে। তিনি যাকে সঠিক পথ দেখাতে চান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তাকে কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ছাড়া সত্যিকার কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। যিনি তাঁর রিসালাত ও আমানত যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন এবং মৃত্যু অবধি তিনি আল্লাহর রাস্তায় সাধ্যমতো জিহাদ করেছেন। দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক তার পরিবার ও অনুসারীদের উপর কিয়ামতের পূর্বপর্যন্ত।

অতঃপর, নিশ্চয় সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর বাণী ও হেদায়াতের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর পথ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা। কারণ প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহর বাণী, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করে চলো এবং প্রকৃত মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০২)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো। দীর্ঘ আশা ও মৃত্যুর কথা ভুলে যাওয়া যেন তোমাদের ধোঁকা দিতে না পারে। তোমরা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যেয়ো না, কেননা তা হলো অস্থায়ী ঠিকানা এবং পরীক্ষার জায়গা। আর আখেরাত হলো চিরস্থায়ী ও প্রতিদানের জায়গা। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ 'প্রত্যেক আত্মাই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। আর কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রাপ্য পরিপূর্ণই দেওয়া হবে। অতএব, যাকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই মূলত সফলতা অর্জন করবে। আর দুনিয়ার জীবন কেবল ধোঁকাস্বরূপ' *(আলে ইমরান, ৩/১৮৫)*।

হে মানুষ সকল! সময়ের গতিতে আবহাওয়া এক অবস্থা হতে আরেক অবস্থায় পরিবর্তন হচ্ছে ও দিন-রাতের পরিবর্তন ঘটছে এবং একের পর এক ঋতুসমূহের পালাবদল হচ্ছে। কখনও প্রচণ্ড ঠান্ডা, কখনও প্রচণ্ড গরম, কখনও আবার নাতিশীতোষ্ণ। এগুলো মূলত সবই আল্লাহর রহস্য। আর আল্লাহর নিকট এর সবকিছুর পরিমিত মাত্রা রয়েছে। আল্লাহর বাণী, 'নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টির মাঝে, রাত ও দিনের এই আবর্তনের মাঝে, সাগরে ভাসমান জাহাজসমূহে, যা মানুষের জন্য কল্যাণকর দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে (বৃষ্টি আকারে) যা কিছু নাযিল করেন (সেই বৃষ্টির) পানির মাঝে, ভূমির নির্জীব হওয়ার পর তিনিই পানি দ্বারা তাতে নতুন জীবন দান করেন, অতঃপর এখানে তিনি সব ধরনের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটান, অবশ্যই বাতাসের প্রবাহ সৃষ্টি করার মাঝে এবং সেই মেঘমালা— যাকে আসমান-জমিনের মাঝে বশীভূত করে রাখা হয়েছে, তাতে সুস্থ বিবেকবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৬৪)*।

হে মুসলিমগণ! নিশ্চয় গ্রীষ্মের জ্বলন্ত তাপদাহ এবং প্রকৃতি ঝলসানো লু-হাওয়া অনেক বড় স্পষ্ট সতর্ককারী এবং আল্লাহর শাস্তি হতে কঠোর নছীহতকারী। যে জাহান্নামে রয়েছে প্রজ্বলিত আগুন, যার তীব্রতা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহর বাণী, ﴿إِنَّهَا لَظَى - نَزَّاعَةً لِلشَّوَى - تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى - وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ 'কক্ষনো নয়! নিশ্চয় জাহান্নাম হচ্ছে একটি প্রজ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা, যা চামড়া ও তার অভ্যন্তরীণ মাংসগুলোকে খসিয়ে দেবে। সেদিন সে আগুন এমন সব লোকদের ডাকবে, যারা (দুনিয়ার জীবনে তা থেকে) ফিরে গিয়েছিল এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, (যারা বিপুল) ধনরাশি জমা করে তা আগলে রেখেছিল' *(আল-মাআরিজ, ৭০/১৫-১৮)*। নিশ্চয় জাহান্নাম হচ্ছে লু-হাওয়া ও গরম পানি এবং আশ্রয়স্থলে থাকবে কালো ধোঁয়া, যেখানো কোনো শীতলতা বা আতিথেয়তা থাকবে না।

হে আল্লাহর বান্দা! নিশ্চয় গরমের প্রচণ্ড উত্তাপ হলো জাহান্নামের শ্বাসপ্রশ্বাস। হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'জাহান্নাম তার রবের কাছে

www.al-itisam.com

অভিযোগ করে বলল, হে আমার রব! আমার কিছু অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। এর ফলে আল্লাহ জাহান্নামকে দুটি নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি প্রদান করেন, যার একটি হলো শীতকালে আর অপরটি হলো গ্রীষ্মকালে। এর কারণেই তোমরা শীতকালের ঠান্ডা ও গ্রীষ্মকালের উত্তাপ অনুভব করে থাক'।[১]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা জাহান্নামের আগুন হতে নিজেদের রক্ষা করো যদিও একটি খেজুরের আঁটির ছিলকা দিয়ে হলেও। আল্লাহর কসম করে বলছি! দুনিয়ার আগুন সহ্য করার মতো কারো ক্ষমতা নেই তাহলে আখেরাতের আগুন কীভাবে সহ্য করবে? আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা মানুষেরা যে আগুন জ্বালিয়ে থাক জাহান্নামের আগুনের তুলনায় তার ৭০ ভাগের মাত্র এক ভাগ উত্তাপ রয়েছে। ছাহাবীগণ বলল, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট হতো। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'জাহান্নামের আগুনকে দুনিয়ার আগুনের তুলনায় ৬৯ গুণ বেশি শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। আর প্রত্যেক গুণ দুনিয়ার আগুনের সমান'।[২]

আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয় গ্রীষ্মকালের তাপদাহ কিয়ামতের মাঠের ভয়াবহ অবস্থা এবং মানুষকে যে তাদের রবের কাছে বিবস্ত্র, নগ্নপদ ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ - خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ 'তারা যেন কোনো শিকারের দিকে ছুটে চলেছে, তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, অপমান ও লাঞ্ছনায় তাদের সবকিছু থাকবে আচ্ছন্ন; তাদের বলা হবে এটাই হচ্ছে সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছিল' *(আল-মাআরিজ, ৭০/৪৩-৪৪)*।

সেই কিয়ামতের দিন অবস্থা কঠিনতর হবে এবং বিপদ-আপদ, দুঃখকষ্ট প্রকটতর হবে এবং সূর্য সৃষ্টিকুলের মাথার নিকটবর্তী হয়ে যাবে, উত্তাপ প্রচণ্ড আকার ধারণ করবে, কঠিন ভিড় হবে, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। হাদীছে এসেছে, মিক্বদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'কিয়ামতের মাঠে সূর্যকে সৃষ্টিকুলের এতটা নিকটবর্তী হবে যে, তার দূরত্ব হবে এক মাইল। ফলে সেই দিন মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। তাদের মধ্যে কারো টাখনু পর্যন্ত, আবার কারো হাঁটু পর্যন্ত, আবার কারো কোমর পর্যন্ত, আবার কেউ ঘামে হাবুডুবু খেতে থাকবে'।[৩]

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩২৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৫; মিশকাত, হা/৫৯১।
২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৪৩; তিরমিযী, হা/২৫৮৯।
৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৬৪; মিশকাত, হা/৫৫৪০।

হে মুসলিম সম্প্রদায়! দুনিয়া এক অস্থায়ী নেয়ামত, যার ছায়া হলো ক্ষণস্থায়ী এবং সময় হলো অল্প কয় দিনের। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ 'পার্থিব জীবন তোমাদের কোনো রকম প্রতারিত করতে না পারে এবং প্রতারক শয়তানও যেন কখনো তোমাদের আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে কোনো ধোঁকা দিতে না পারে' *(লুক্বমান, ৩৩/৩৩)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'এ পার্থিব জীবনের উদাহরণ (হচ্ছে) যেমন আমি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করলাম, তা দ্বারা অতঃপর জমিনের গাছপালা ঘন সন্নিবেশিত হয়ে উদগত হলো যা থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার তাদের আহার সংগ্রহ করলে; এরপর যখন জমিন তার সৌন্দর্যের রূপ ধারণ করল এবং আপন সৌন্দর্যে সে শোভিত হয়ে উঠল, তখন তার মালিক মনে করলে, তারা বুঝি এর (ফসল ভোগ করার) উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান (এ সময় হঠাৎ করে) রাতে কিংবা দিনে আমার (আযাবের) ফয়সালা তাদের উপর আপতিত হলো, অতঃপর আমি তাদের এমনভাবে নির্মূল করে দিলাম যেন গতকাল তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না; চিন্তাশীল লোকদের জন্য এভাবেই আমি আমার আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি' *(ইউনুস, ১০/২৪)*।

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি সাহায্যের সাহায্যদাতা, নিরুপায় ব্যক্তির ডাকে সাড়াদানকারী, বিপদগ্রস্তদের বিপদ উদ্ধারকারী এবং সকল মানুষের উপর তার নেয়ামতসমূহকে পরিপূর্ণকারী। আল্লাহর বাণী, ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ 'জমিনের উপর বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই, যার রিযিক্বের দায়িত্ব আল্লাহর নয়, তিনি যেমন তার আবাস সম্পর্কে অবহিত, (তেমনি তার মৃত্যুর পর) তাকে যেখানে সোপর্দ করা হবে তাও (তিনি জানেন); এসব বিবরণ একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে' *(হূদ, ১১/৬)*।

হে আল্লাহর বান্দা! গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড উত্তাপ ও প্রবল ঝড়ের মাঝে ধুলোবালি উড়ার মাধ্যমে যে দৃশ্য আমরা থাকি তা আমাদের একটি বিষয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তা হলো, দুর্বল ও অপারগদের কথা। তারা এতে ভীষণ কষ্ট পায়। তা থেকে বাঁচার কোনো পথ খুঁজে পায় না। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো তাদের প্রতি দয়া করা, তাদের প্রয়োজন মেটানো, তাদের সহযোগিতা করা এবং তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া। কেননা তাদের মাধ্যমেই তোমরা রহমত ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক। অতএব, তোমরা তাদের চিন্তা, দুর্দশা ও কাঠিন্য দূর করার চেষ্টা করো। কেননা যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তির দুনিয়ার দুশ্চিন্তা দূর করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার হতেও দুশ্চিন্তা দূর করবেন। আর যে অসচ্ছল ব্যক্তির উপর সহজতা

www.al-itisam.com

অবলম্বন করবে আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সচ্ছলতা দান করবেন, আর যে কোনো মুসলিম ব্যক্তির দোষ গোপন করবে আল্লাহও তার দুনিয়া ও আখিরাতে দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আল্লাহ কোনো বান্দার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত সহযোগিতা করে থাকেন যতক্ষণ সে অন্য ভাইয়ের প্রতি সহযোগিতা করে থাকে।

হে আল্লাহর বান্দা! তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ (ক্বরযে হাসানা) দাও তাহলে আল্লাহও এর বিনিময়ে তোমাদের সম্পদকে দ্বিগুণে পরিণত করবেন এবং সাথে তোমাদের গুনাহগুলোও ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে ‘ক্বরযে হাসানা’ দিবে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার (সম্পদে) আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৪৫)*। আল্লাহ তাআলা অপর আয়াতে বলেন, ‘তোমরা ভালো ও উত্তম কাজ হতে যা নিজেদের জন্য আগেভাগেই আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে রাখবে তা তোমরা তার কাছে সংরক্ষিত পাবে, পুরস্কার ও এর বর্ধিত পরিমাণ হিসাবে তা হবে অতি উত্তম’ *(মুযযাম্মিল, ৭৩/২০)*।

যে ব্যক্তি অসচ্ছলকে অবকাশ দিয়ে অথবা ঋণ কমিয়ে সহযোগিতা করবে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তাকে কিয়ামতের মাঠে তার ছায়া প্রদান করে সম্মানিত করবেন। যেদিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি অসচ্ছলকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ কমিয়ে দিবে, তাহলে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের মাঠে তার আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না’।[৪]

হে লোক সকল! প্রচণ্ড উত্তাপের সময় উদাসীন ও অলস ব্যক্তির যেমন ইবাদত কবুল করা হয় না, তেমন ঐ ব্যক্তিরও যে জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করা হতে সব সময় অলসতা করে থাকে। এই কষ্টের সময়ে ছওয়াবের আশা করা অনেক মহৎ ব্যাপারে। কেননা কষ্ট ও যন্ত্রণার মাধ্যমেই ছওয়াব অর্জিত হয়। আর জান্নাতকে কষ্ট দ্বারাই ঘিরে রাখা হয়েছে। গরমের সময় হলো পরীক্ষা ও ভোগান্তির সময়। আল্লাহ তাআলা মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তিনি তাদের মধ্যে কে উত্তম আমল করছে তা পরীক্ষা করে নিতে পারেন। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো মৃত্যুর পূর্বেই ভালো আমল করা। কেননা যার অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে তাকে আল্লাহ কিয়ামতের মাঠে তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দিয়ে সম্মানিত করবেন। যেমনটি হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন; যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। তার একজন হলো— ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলানো থাকে।[৫]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহর বিভিন্ন নেয়ামত ও নিদর্শনাবলির জন্য তারই প্রশংসা জ্ঞাপন করো এবং তাঁর শুকরিয়া ও মহত্ত্ব বর্ণনা করো, কেননা তিনি তোমাদের উপর তাঁর নেয়ামতসমূহ গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করেছেন। তিনি বলেন, ‘যা তোমাদের উপর নেয়ামত পাঠানো হয় তা মূলত আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়’ *(আন-নাহল, ১৬/৫৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ ‘যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গননা কর, তাহলে তোমরা তা গননা করে শেষ করতে পারবে না’ *(ইবরাহীম, ১৪/৩৪)*। তিনি তোমাদের জন্য পাহাড়কে পেরেকস্বরূপ করেছেন, পোশাককে গরম হতে রক্ষা করার মাধ্যম বানিয়েছেন এবং তিনি বিদ্যুৎ, ঠান্ডা করার যন্ত্রসহ বিভিন্ন যন্ত্রাদি দিয়েছেন। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করে তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। খরচ করার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা এবং অপচয় ও নষ্ট করা হতে বিরত থাকা। কারণ, যখন কোনো নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তখন তা স্থায়ী হয়। অপরপক্ষে নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলে তা স্থায়ী হয় না। আল্লাহর বাণী, ‘যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, তাহলে আমি তোমাদের প্রতি আরো অনুগ্রহ বাড়িয়ে দিব। আর যদি আমার নেয়ামতের অস্বীকার কর তাহলে জেনে রেখো আমার আযাব বড়ই কঠিন’ *(ইবরাহীম, ১৪/৭)*।

অতএব, একজন মুমিনের কর্তব্য হলো, তাদের যে সকল নেয়ামত দেওয়া হয়েছে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, আল্লাহ কর্তৃক যা ফয়সালা করা হয়েছে তার প্রতি সন্তুষ্টি থাকা এবং তার প্রতি প্রশংসা ও তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। সাথে সাথে এ কথা বিশ্বাস রাখা যে, সকল বিষয় তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

অতঃপর সম্মানিত খত্বীব ইসলাম, মুসলিম, হারামাইন, মুসলিম নেতৃবর্গ ও সকল মুসলিম দেশসমূহের জন্য কল্যাণের দু‘আ করে খুৎবা শেষ করেন।

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭০৪; তিরমিযী, হা/১৩০৬; মিশকাত, হা/২৯০৬।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৪২৭; তিরমিযী, হা/২৩৯১।

www.al-itisam.com

শারঈ বিষয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও সালাফে ছালেহীন যেমন ছিলেন

-তাওহীদুর রহমান ইবনু মঈনুল হক্ব*

মুসলিম বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও উলামায়ে কেরামের মধ্যে শরীআতের বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলে মতানৈক্য দেখা যায়। আর এই মতভেদের কারণে ধীরে ধীরে বিভিন্ন দল ও ফেরকা তৈরি হয়েছে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ 'আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০৩)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾

'নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই' *(আল-আনআম,৬/১৫৯)*।

এ জাতীয় বহু প্রমাণ আছে যা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐক্যবদ্ধভাবে জীবনযাপন করা এবং দলাদলি হতে বিরত থাকা প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও জ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ কারণবশত মতভেদ থাকতে পারে।

জ্ঞানীদের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা যায়, তার অধিকাংশই ছোটখাটো বা শাখাগত বিষয়। এইসব মতভেদ সম্পূর্ণরূপে মিটানো সম্ভব নয়, তবে কমানো অবশ্যই সম্ভব। এই মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও পরস্পরকে সম্মান করা, সৌজন্যমূলক আচরণ করা, গালমন্দ ও খারাপ সমালোচনা থেকে বিরত থাকা প্রকৃত মুসলিমের পরিচয়। তাছাড়া মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে মিলেমিশে থাকা যায় এবং এক্ষেত্রে ইসলামের যে শিক্ষা রয়েছে তার আলোকে কীভাবে নিজেদের জীবন গড়া যায়, তা নিয়ে সর্বদা ভাবতে হবে। এ বিষয়ে বিশেষ করে আলেম সমাজকে বেশি ভাবতে হবে এবং উদারতার পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

মহান আল্লাহ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ 'তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে' *(আল-মায়েদা, ৫/৫৪)*। মুমিনের প্রতি নরম আর কাফেরের প্রতি কঠোর আচরণ করা প্রত্যেক মুমিনের নৈতিক আদর্শ হওয়া যেমনটি ছিল ছাহাবায়ে কেরামের আচরণ। পরস্পরের মধ্যে মুমিনের আচরণ কেমন হবে এবং কাফেরের সাথে সে কেমন ব্যবহার করবে তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ 'তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল' *(আল-ফাতহ, ৪৮/২৯)*।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, নিজেদের মধ্যে সামান্য মতভেদকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যায় যে, কেউ কাউকে একদমই সহ্য করতে পারে না। আর মাযহাবী ক্ষেত্র হলে তো কথাই নেই। সেটা তিক্ততার এমন কঠিন পর্যায়ে চলে যায় যে, তা কোনো অমুসলিমের ক্ষেত্রেও ঘটে না। নিজের মত বা বিশ্বাসকে অভ্রান্ত সত্যের উৎস মনে করে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় যে, তাকেই একমাত্র দ্বীন হিসেবে বিবেচনা করা হয়; যা মোটেও কাম্য নয়। তারা মনে করছে যে, নিজ পথ বা মাযহাবের প্রচার করছে মানে প্রকৃত দ্বীন প্রচার করছে।

নিজের বিশ্বাস বা মাযহাব রক্ষার চেষ্টা করা মানে দ্বীন রক্ষার চেষ্টা করা। এটাই আমাদের দুর্বলতার বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শরীআতের মাসআলা-মাসায়েল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তুলনামূলকভাবে মতভেদপূর্ণ মাসআলা কম, কিন্তু এই মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলোই বেশির ভাগ সময় বিজয়ী হয়ে থাকে। সর্বদাই আমরা এসব মাসআলার পেছনে লেগে রয়েছি অথচ শরীআতের আরও অনেক মাসআলা আছে, যাতে কোনো রকম মতপার্থক্য নেই। সেগুলো নিয়ে আমাদের সেরকম আলোচনা হয় না বললেই চলে। কেন এই অবস্থা? যখন এতগুলো বিষয়ে ঐক্য রয়েছে। তখন আংশিক বিষয়গুলোতে কেন ঐক্য হয় না? ইখতিলাফী বিষয়গুলো কেন সর্বদা প্রাধান্য পাচ্ছে? এসব বিষয় সব সময় কেন আমাদের মস্তিষ্কে ও সমাজে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে?

'আদাবুল খেলাফ' অর্থাৎ মতভেদের আদব সম্পর্কে অনেক লেখনি, প্রবন্ধ, বই ইত্যাদি লেখা হয়েছে। এই বিষয়ের মূলকথা এই যে, একে অপরের সাথে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও

* শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, ভারত।

www.al-itisam.com

পরস্পরকে সম্মান করতে হবে, ভালোবাসা বজায় রাখতে হবে, মিলেমিশে থাকতে হবে, সহযোগিতা করতে হবে, পরামর্শ দিতে ও নিতে হবে ইত্যাদি। এসব বিষয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়।

এর অনেক দৃষ্টান্ত স্বর্ণ যুগ থেকে আজ পর্যন্ত হাদীছের পাতায়, ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়।[১]

কতিপয় উদাহরণসমূহ :

(১) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতভেদ : উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দুজনেই বিখ্যাত ছাহাবী ছিলেন। ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলছেন যে, দুজনের মধ্যে ১০০টিরও অধিক বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল। চিন্তা করুন! ১০০টিরও অধিক বিষয়ে মতভেদ ছিল, কিন্তু তারা কি পরস্পর ঝগড়া করতেন? অশালীন সমালোচনা করতেন? পরস্পরে ঘৃণা করতেন? না, কখনোই না। তাদের জীবনীতে লেখা রয়েছে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সম্পর্কে বলতেন যে, كَنِيفٌ مُلِئَ عِلْمًا أَتْرُتُ بِهِ أَهْلَ الْقَادِسِيَّةِ 'তিনি (ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হচ্ছেন ইলমের আশ্রয়স্থল, আমি তাঁর কারণেই কাদেসিয়াবাসীদের প্রতি প্রভাবিত হয়েছি'।[২]

শত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তার জ্ঞানের প্রশংসা করছেন। অপরদিকে ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মৃত্যুর পর বলতেন,

إِنَّ عُمَرَ كَانَ لِلْإِسْلَامِ حِصْنًا حَصِينًا يَدْخُلُ فِيهِ الْإِسْلَامُ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ انْثَلَمَ الْحِصْنُ فَالْإِسْلَامُ يَخْرُجُ مِنْهُ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ

'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন ইসলামের এক অতি মযবূত দূর্গ, তার মাধ্যমে ইসলাম (বিভিন্ন স্থানে) প্রবেশ করেছিল কিন্তু কখনোও (সে স্থানগুলো থেকে) ইসলাম বের হয়নি। যখন তিনি শহীদ হয়ে গেলেন, তখন সে দূর্গ ভেঙে গেল, ফলে সেখান থেকে ইসলাম বেরিয়ে গেল আর প্রবেশ করল না'।[৩] এই ছিল তাদের পরস্পর ভালোবাসা ও সম্মানের দৃষ্টান্ত। আজ আমরা কোথায়?

(২) যায়েদ ইবনু ছাবিত ও আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মতভেদ : আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)সহ অনেক ছাহাবীর মতোই ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মত ছিল যে, পিতার উপস্থিতিতে যেমন মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার থেকে ভাই-বোন বঞ্চিত হয়ে যায়, ঠিক তেমনি দাদার উপস্থিতিতেও ভাই-বোন বঞ্চিত হয়ে যাবে। কিন্তু যায়েদ ইবনু ছাবিতসহ অন্যান্য ছাহাবীর মত ছিল, দাদার উপস্থিতিতে ভাই-বোনের অংশ বলবৎ থাকবে।

একদিন ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার! যায়েদের আল্লাহর ভয় হয় না? পৌত্র (পোতা)-কে পুত্রের স্থান দিচ্ছে কিন্তু দাদাকে পিতার স্থান দেয় না!

তবুও দেখুন, পরস্পরের ভালোবাসা ও সম্মান। একদা ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আরোহণ অবস্থায় দেখলেন। তারপর ইবনু আব্বাস যায়েদ ইবনু ছাবিতের পশুর লাগাম ধরে চলতে লাগলেন। তাঁকে লাগাম ছাড়তে বলা হলে, তিনি বললেন, উলামা ও বড়দের সাথে আমাদের এ ধরনের আচরণ করতে হুকুম দেওয়া হয়েছে। এবার যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আপনার হাতটা আমাকে একটু দেখাবেন? সঙ্গে সঙ্গে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজের হাতখানা বের করে দেখালেন। দেখামাত্রই যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার হাতে চুমু দিয়ে বলেন, আমাদের নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আহলে বায়েতের সাথে এ ধরনের আচরণ করতে বলা হয়েছে।

এছাড়া যখন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মৃত্যু হয়, তখন ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন, এভাবেই জ্ঞান শেষ হয়ে যাবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এভাবেই ইলম শেষ হয়ে যায়, আজকে অনেক জ্ঞান দাফন করা হলো।

এই ছিল ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও ভালোবাসা ও সম্মানের দৃষ্টান্ত। ছাহাবীগণের এরকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আহযাব যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে আমাদেরকে বললেন, বনূ কুরাইযা এলাকায় পৌঁছার আগে কেউ যেন আছরের ছালাত আদায় না করে। কিন্তু অনেকের পথিমধ্যেই আছরের সময় হয়ে গেল, তখন তাদের কেউ কেউ বললেন, আমরা ছালাত আদায় করে নেব, আমাদের নিষেধ করার এ উদ্দেশ্য ছিল না (বরং উদ্দেশ্য ছিল তাড়াতাড়ি যাওয়া)। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এ কথা উল্লেখ করা হলে, তিনি তাঁদের কারোর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেননি।

(ছহীহ বুখারী, হা/৯৪৬)।

১. শায়খ আসআদ আ'জামী (হাফিযাহুল্লাহ) (শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, ভারত)-এর লেখনী থেকে নেওয়া কিছু অংশ।
২. তারিখে দেমাশক, ৩৩/১৪৫।
৩. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৩১৩৫৫।

www.al-itisam.com

আফগানিস্তান, তালেবান ও খোরাসান : বর্তমান প্রেক্ষাপট

-আবু মুহাম্মাদ*

পাঠক হয়তো যতক্ষণ এই লেখাটি পড়বেন, ততক্ষণে কাবুলসহ পুরো আফগানিস্তান তালেবানের নিয়ন্ত্রণে হতে পারে। আবার এটাও হতে পারে যে, আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে –*আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন*–। অবস্থা যেটাই হোক সমগ্র পৃথিবীতে এখন টক অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড হচ্ছে— তালেবানের প্রত্যাবর্তন। আজকের বক্ষমান প্রবন্ধে আমরা উক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা পেশ করব ইনশা-আল্লাহ।*

আফগানিস্তানের ইতিহাস : আদিকাল থেকেই আফগানিস্তান পাহাড়-পর্বতে ঘেরা মরু এলাকা। হিন্দুকুশ পর্বতমালা, খায়বার পাস, আমু দরিয়া এগুলো আফগানিস্তানের বৈচিত্র্যময় পরিবেশের একেকটি বড় নিয়ামক। বহু ঐতিহাসিক ঘটনা বিজড়িত এই আফগানিস্তান। যুদ্ধ-বিগ্রহের দিক থেকে দেখলে বড় বড় মুজাহিদ শাসক এই জমিন আবাদ করেছেন। যেমন ১৭ বার ভারত আক্রমণ করা সুলতান মাহমূদ গজনভী অন্যতম। গজনী শহরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল তাঁর সাম্রাজ্য। গজনী নামে শহরটি এখনো আফগানিস্তানে আছে। গুজরাটের রাজপুত ও পাঞ্জাবের মারাঠাদেরকে বিখ্যাত পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করতে আফগানিস্তান থেকে জিহাদ করতে এসেছিলেন আহমাদ শাহ আবদালী। আফগানিস্তানের কাবুল ও হিরাতের মাঝে অবস্থিত ঘুর নামক শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে মুহাম্মাদ ঘুরীর ঘুরী সাম্রাজ্য। এই জমিন থেকেই মঙ্গোলীয়দের সামনে সিনা টান করে যুদ্ধ করেছিলেন জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ। দিল্লীর যারা মোঘল শাসক ছিলেন, তারাও মূলত আফগানিস্তান থেকেই এসেছিলেন। যহীরুদ্দীন মুহাম্মাদ বাবর আফগান থেকে এসে ইবরাহীম লোদিকে পরাজিত করে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বুঝা গেলো, দীর্ঘ একটা সময় ধরে পাক-ভারতের ভূ-রাজনীতিতে আফগানদের একক আধিপত্য ছিল, যা অনস্বীকার্য সত্য।

খোরাসান : আফগানিস্তান নামটির সাথে খোরাসান নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খোরাসান শব্দ ব্যবহার করে অনেক হাদীছ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদীছ তাহক্বীক্বসহ নিম্নে পেশ করা হলো—

* নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হাদীছ : ১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ لَا يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ.

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘খোরাসান থেকে কালো পতাকা বের হবে। এই পতাকাকে কেউ থামাতে পারবে না; এমনকি এই পতাকা বায়তুল মাক্বদিসে স্থাপিত হবে’।[১]

তাহক্বীক্ব : উক্ত হাদীছের সনদে রিশদীন ইবনু সা‘দ নামক একজন রাবী আছেন, যিনি যঈফ। তাকে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, আবূ হাতিম, ইমাম আহমাদ ও নাসাঈসহ অধিকাংশ মুহাদ্দিছ যঈফ বলেছেন।[২]

হাদীছ : ২

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ خَرَجَتْ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَأْتُوهَا وَلَوْ حَبْوًا فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِيَّ».

ছাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যখন তোমরা দেখবে যে, খোরাসান থেকে কালো পতাকা বের হবে তখন তোমরা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার সাথে যুক্ত হও। কেননা তাদের মধ্যেই আল্লাহর খলীফা মাহদীকে পাবে’।[৩]

তাহক্বীক্ব : খোরাসান কেন্দ্রিক বর্ণিত এটিই সবচেয়ে কম দুর্বল হাদীছ। এই সনদের সকল রাবী মযবূত। তবে আবূ ক্বিলাবা একজন মুদাল্লিস রাবী। তিনি এই হাদীছ ‘আন’ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সনদটি যঈফ। যদিও আবূ ক্বিলাবা ইবনু হাজার আসক্বালানীর নিকট প্রথম স্তরের মুদাল্লিস।[৪] ইবনু হাজার আসক্বালানী এই রাবীকে প্রথম স্তরে রেখেছেন। কারণ হচ্ছে আবূ ক্বিলাবা থেকে আনআন সূত্রে আবূ আসমা ও ছাওবান হয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত হুবহু এই সনদে কিছু হাদীছ ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। আর আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অনেক হাদীছ যা আবূ ক্বিলাবা থেকে ‘আনআন' সূত্রে বর্ণিত

১. মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৭৭৫।
২. আল-কামিল, ৪/৬৮; ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত তা‘দীল, ৩/৫১৩।
৩. মুসতাদরাকে হাকেম, হা/৮৫৩১।
৪. আহলিত তাক্বদীস, ১/২১।

ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম শরীফে আছে। তবে হাদীছটির সনদের সমালোচনার পাশাপাশি মতনেও 'নাকারাত' (সমালোচনা) আছে বলে মন্তব্য করেছেন ইমাম নাছিরুদ্দীন আলবানী। বিশেষ করে আল্লাহর খলীফা মাহদী তাদের সাথে থাকবেন এই বাক্যটি বহু ছহীহ হাদীছের বিরোধী।

উল্লেখ্য, ছাওবান থেকে বর্ণিত এই হাদীছের আরো কিছু সনদ আছে, তবে সেগুলো আরো দুর্বল। যেমন মুসনাদে আহমাদের (হা/২২৩৮৭) সনদে শারীক ইবনু আব্দুল্লাহ আন-নাখঈ ও আলী ইবনু যায়েদ আছেন, যারা উভয়েই দুর্বল রাবী।[৫] এছাড়া বায়হাক্বীর দালায়িলুন নবুঅতে (৬/৫১৬) হাদীছটি মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

সারমর্ম : খোরাসান নাম নিয়ে যতগুলো হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোতেই দুর্বলতা আছে।

একমাত্র ছহীহ হাদীছ : একদা রাসূল ﷺ সালমান ফারসী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর উপর হাত রেখে বললেন,

«لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا، لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلاَءِ»

'ঈমান যদি ছুরাইয়া তারকার কাছেও থাকে, তবুও সালমান ফারেসীদের লোকেরা ঈমানকে সেখান থেকে নিয়ে আসবে'।[৬] অন্য বর্ণনায় ঈমানের জায়গায় দ্বীনের কথা বলা হয়েছে। অন্য আরেক বর্ণনায় ঈমানের জায়গায় ইলমের কথা বলা হয়েছে।[৭]

ফারেসগণ হচ্ছে নূহ আলাইহিস সালাম-এর ছেলে সামের বংশধর। যাদেরকে আজম বা অনারব বলা হয়। ফারেস বা ফুরস বলতে সাধারণত 'বিলাদ মা ওরায়িন নাহার' বুঝানো হয়। কেননা কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ইমাম মাহদীকে সহযোগিতা করার জন্য একদল মানুষ 'মা ওরায়িন নাহার' থেকে বের হবে মর্মে কিছু রিওয়ায়েত পাওয়া যায়।[৮] যদিও এই বিষয়ে মারফূ' সূত্রের বর্ণিত প্রায় রেওয়ায়েত দুর্বল। ইমাম যুহরী থেকে মুরসাল সূত্রে হাসান কিছু বর্ণনা রয়েছে, যা দলীল হিসেবে যথেষ্ট নয়।[৯]

যাহোক, ইমাম ইয়াকুত আল-হামাবী রহিমাহুল্লাহ তার মু'জামুল বুলদান গ্রন্থে 'মা ওরায়িন নাহার' বিষয়ে বলেন, يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان 'এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, খোরাসানের জায়হূন নদীর পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চল'।[১০] জায়হূন নদীকে স্থানীয় ভাষায় বর্তমানে 'আমু দরিয়া' বলা হয়। বর্তমান আফগানিস্তানের বাদাখশান প্রদেশের ওয়াখান করিডোরের পর্বতমালা থেকে আমু দরিয়ার উৎপত্তি। এরপর আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের মধ্য দিয়ে অরল সাগরে পতিত হয়েছে শ্লথ গতির এই নদীটি। সেই হিসেবে উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তানের বৃহৎ অংশ 'মা ওরায়িন নাহার'-এর অন্তর্ভুক্ত বা খোরাসান হিসেবে গণ্য। যুগে যুগে অনেক মহান মুহাদ্দিছ এই এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অন্যতম— ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনু মাজাহ, ইমাম দারেমী, ইমাম বায়হাক্বী ও ইমাম ইবনু খুযায়মা রহিমাহুমুল্লাহ। যা রাসূল ﷺ-এর হাদীছের সত্যতার প্রমাণ বহন করে।[১১] খোরাসান তথা 'বিলাদ মা ওরায়িন নাহার' এর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে যেগুলো সে সময় ইলমের মারকায ছিল তার কিছুর নাম নিম্নে পেশ করা হলো—

বোখারা : বর্তমান উজবেকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারীর জন্মস্থান।

সমরকন্দ : বর্তমান উজবেকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম দারেমীর জন্মস্থান।

তিরমিয : ইমাম তিরমিযীর জন্মস্থান। আমু দরিয়ার তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি গ্রাম যা এখনো তিরমিয নামে প্রসিদ্ধ। আফগানিস্তানের মাযার শরীফের পাশে উজবেকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত এই গ্রামটি।

বুস্ত : হাদীছ শাস্ত্রের দুই মহান ইমাম— ইমাম ইবনু হিব্বান ও ইমাম খত্ত্বাবীর জন্মস্থান। বর্তমান আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের লশকারগাহ নামক জায়গাটিই মূলত সেই কালের বুস্ত নগরী। যেখানে ইবনু হিব্বান ও ইমাম খাত্ত্বাবী রহিমাহুমাল্লাহ বেড়ে উঠেছেন।

সিজিস্তান : ইমাম আবূ দাঊদের জন্মস্থান। বর্তমান আফগানিস্তান, ইরান ও পাকিস্তান সীমান্তবর্তী যে বালূচ অঞ্চল, এটাই মূলত সেই সময়ের সিজিস্তান। এখানেই ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ-এর জন্ম ও বেড়ে উঠা।

---

৫. মীযানুল ই'তিদাল, ৩/১২৮।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৪৮৯৭।
৭. ফাতহুল বারী, ৮/৬৪২।
৮. আবূ দাঊদ, হা/৪২৯০; নুয়াইম ইবনু হাম্মাদ, ফিতান, হা/৯১৩; ইবনু মাজাহ, হা/৪০৮৪ ও ৪০৮২।
৯. নুয়াইম ইবনু হাম্মাদ, ফিতান, হা/৫৪৫, পৃ. ২০৯-৩০০।
১০. মু'জামুল বুলদান, ৫/৪৫।
১১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ড. রামাযানের লিখিত আয়িম্মাতু ইলমিল হাদীছ ফী বিলাদ মা ওরায়িন নাহার।

www.al-itisam.com

নিশাপুর : বর্তমান ইরানে অবস্থিত। ইমাম বুখারী বোখারা থেকে হিজরত করে এই নিশাপুরেই এসেছিলেন। এখানেই ইমাম মুসলিম, ইমাম হাকেম ও ইমাম ইবনু খুযায়মার বেড়ে উঠা এবং তাদের দারস-তাদরীসের স্থান।

রাই : বর্তমান ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে অনতিদূরে অবস্থিত। হাদীছ জগতের দুই দিকপাল ইমাম— আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম আবূ যুরআ আর-রাযী উভয়েই এই রাইয়ে বেড়ে উঠেছেন এবং এখানেই দারস দিয়েছেন। রাই নগরীর দিকে সম্পৃক্ত করেই তাদেরকে রাযী বলা হতো।

বালখ : বর্তমান আফগানিস্তানে অবস্থিত। ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ইবনে সিনা, উমার খইয়্যাম, খাওয়ারিযমীসহ অনেকেই এই শহরে জ্ঞান হাছিল করতে আসতেন।

হিরাত : বর্তমানে আফগানিস্তানে অবস্থিত। ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল ছিল। জালালুদ্দীন রূমী, শাহনামার লেখক বিখ্যাত কবি ফেরদৌসীসহ বহু আলেম-ওলামার পদধূলি রয়েছে এখানে।

বাগলান : বর্তমান আফগানিস্তানে অবস্থিত। কুতুবে সিত্তাহর সংকলক ছয় জন ইমামের শিক্ষক কুতায়বা ইবনু সাঈদ আল-বাগলানীর জন্মস্থান।

জুযাজান : ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল শাস্ত্রের মহান ইমাম আবূ ইসহাক্ব আল-জুযাজানীর জন্মস্থান হচ্ছে অফগানিস্তানের জুযাজান প্রদেশে, যা এখনো এই নামেই পরিচিত।

মরো : ইংরেজিতে মারভ বলা হয়। আফগানিস্তানের মাযার শরীফ ও হেরাত সীমান্তবর্তী তুর্কমেনিস্তানে অবস্থিত শহরটি এখনো এই নামেই পরিচিত। বড় বড় বিখ্যাত ইমামের জন্ম হয়েছে এই শহরে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে— ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহিমাহুল্লাহ ও ইমাম ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহ রহিমাহুল্লাহ। এছাড়া যত ইমামের নামের শেষে আমরা মারওয়াযী দেখতে পাই, তাদের সকলকে এই শহরের দিকে সম্পৃক্ত করে মারওয়াযী বলা হয়ে থাকে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে আজকের আফগানিস্তান, ইরান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এই অঞ্চলগুলোতেই মূলত হাদীছের সবচেয়ে বেশি খেদমত হয়েছে। বিশেষ করে মৌলিক খেদমতগুলো এই অঞ্চল তথা খোরাসানের ইমামদের হাতেই হয়েছে।

তালেবানের উত্থান : আফগানিস্তানের সাথে তালেবানের নাম জড়িত হয় মূলত রাশিয়ার সাথে যুদ্ধপরবর্তী সময়ে। রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের সময়ে তালেবান নামক কোনো দল ছিল না। ১৯৮৯ সালে রাশিয়ানরা আফিগানিস্তান থেকে নিজেদের পাততাড়ি গুটিয়ে নিলে ১৯৯২ সালে মুজাহিদদের হাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঠপুতলি সরকারের পতন ঘটে। ক্ষমতা দখলের পর যুদ্ধরত মুজাহিদগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। এই গৃহযুদ্ধ চলে দীর্ঘ চার বছর। এই গৃহযুদ্ধ থামিয়ে আফগানিস্তানে শান্তি ফিরিয়ে আনতে কান্দাহারের কিছু মাদরাসা ছাত্রদের নিয়ে মোল্লা মুহাম্মাদ উমার সর্বপ্রথম তালেবান গঠন করেন। তালেবান অর্থ ছাত্র। যেটাকে আমরা আরবীতে ত্বলেব বলে থাকি, সেটাই পশতু ভাষায় তালেবান। শান্তির জন্য মুখিয়ে থাকা আফগানরা তালেবানের মধ্যে আশার আলো দেখতে পায়। দীর্ঘদিনের রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ ও তারপরে নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে ত্যক্তবিরক্ত আফগানরা দলে দলে তালেবানের নিকট অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে থাকে। এভাবে ১৯৯৬ সালে কাবুলের ক্ষমতায় আসে তালেবান। ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মাত্র তিনটি দেশ তালেবানকে স্বীকৃতি প্রদান করে— যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও সঊদী আরব। ক্ষমতায় আসার পর বহুদিনের পুরাতন বামিয়ানের মূর্তি ভেঙে বিশ্বব্যাপী আলোচনায় আসে তারা। যে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের সহযোগিতা করেছিল; যার মদদে ও স্বীকৃতিতে তালেবানরা ক্ষমতায় ছিল, সেই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তালেবানের মধুর হাড়ি ভেঙে যায় টুইন টাওয়ার হামলার পর। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলা হলে আমেরিকা এই হামলার জন্য সরাসরি তালেবানদের দায়ী না করে আফগানে আশ্রয় গ্রহণ করা আল-কায়েদা গ্রুপ ও তাদের নেতা উসামা বিন লাদেনকে দায়ী করেন। তালেবান সরকারের উপর আর্ন্তজাতিক চাপ বাড়তে থাকে উসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তরের জন্য। মোল্লা মুহম্মাদ উমার শেষ সময় পর্যন্ত এই চাপের কাছে নতিস্বীকার করেননি। ফলত আমেরিকা পাকিস্তানকে সাথে নিয়ে ঐতিহাসিক সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ শুরু করে। পতন হয় তালেবান সরকারের। আজও এই নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিশ্লেষণ হয় যে, তালেবানেরা যদি উসামা বিন লাদেনকে সমর্পণ করে দিত, তাহলে এভাবে তাদের ক্ষমতা হারাতে হতো না। কারো মতে এই সিদ্ধান্ত তালেবানদের আত্মমর্যাদার প্রতীক আর কারো মতে এই সিদ্ধান্ত তালেবানদের বোকামি ও হঠকারিতার পরিচয় বহন করে।

আমেরিকার হাতে তালেবান নিয়ন্ত্রিত কাবুলের পতন ঘটলে সেখানে নিজেদের পছন্দমতো সরকার বসায় আমেরিকা।

www.al-itisam.com

পাকিস্তানের এবোটাবাদে ড্রোন হামলা চালিয়ে উসামা বিন লাদেনকে হত্যা করে আমেরিকা। মোল্লা মুহাম্মাদ উমারের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। হাজার হাজার তালেবান পাহাড় ও গুহায় আশ্রয় নেয়। লাখো আফগান সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়। কাবুলে আমেরিকার পছন্দসই সরকার নিয়ে ভারত কোটি কোটি টাকার প্রজেক্ট হাতে নেয় আফগানিস্তানে। সুদীর্ঘ ২০ বছর এভাবেই চলতে থাকে। এর মধ্যে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলগুলোতে পাকিস্তানী তালেবানের উৎপাত বাড়তে থাকে। পাকিস্তান সরকার আফগান তালেবানকে সহযোগিতা করলেও পাকিস্তানী তালেবানকে খারেজী বা জঙ্গী মনে করে। ফলত 'অপারেশন জারব-ই-আযাব'সহ বিভিন্ন ভয়ংকর সেনা অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানের অনেক জঙ্গী গ্রুপকে নিঃশেষ করে দেয় পাকিস্তান। নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে আফগান বর্ডারে কাঁটাতারের বেড়া দেয়, যা ছিল পাকিস্তানের নিরাপত্তার ইতিহাসে এক কঠিনতম সফল প্রজেক্ট। পাকিস্তানপন্থী বিশ্লেষকগণের ধারণা, আফগানিস্তানে ভারতের প্রভাব বাড়তে থাকায় আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও জঙ্গী দলকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে জঙ্গী হামলা চালাতে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে, যার সার্বিক প্রশিক্ষণ ভারত দিয়ে থাকে। তাই আফগানিস্তান থেকে অনুপ্রবশ ঠেকাতে দীর্ঘতম এই বর্ডারে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়।

ধীরে ধীরে দৃশ্যপট চেঞ্জ হতে থাকে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকারের সাথে তালেবানের শান্তিচুক্তি হয়। সরকারি ক্ষমতায় নেই এই রকম একটা দলের সাথে বিশ্বের সুপার পাওয়ারের এই ধরনের চুক্তি হয়তো এটাই প্রথম। চুক্তির প্রায় সব শর্তগুলোই বাহ্যিকভাবে তালেবানদের পক্ষে। যেমন- আগে তালেবান বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে। একটি বিদেশী সেনাও আফগানিস্তানে থাকবে না। চুক্তির আশ্চর্য দিক হচ্ছে, চলমান সরকারের সাথে তালেবানের কোনো ধরনের সমঝোতা না থাকা। আর এটাকেই এই চুক্তির বা আমেরিকার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা বলা হয়। তারা নিজেরা যাদেরকে ধ্বংস করতে এসেছিল, তাদের সাথেই আবার চুক্তি করল। যাদেরকে ২০ বছর যাবত লালনপালন করল, সেই কাবুল সরকারের সাথে কোনো সমঝোতাও করিয়ে দিতে পারল না তালেবানের। এমনকি কাবুল সরকারের টিকে থাকার সামান্যতম নিশ্চয়তাও দিতে পারল না আমেরিকা। শুধু তাই নয়, সাংবাদিকদের দাবি অনুযায়ী, রাতের আঁধারে বাতি নিভিয়ে নিজেদের অনুগত সরকারকে অবহিত না করে চুপিসারে তাদের বিখ্যাত কেন্দ্রীয় সেনাঘাঁটি বাগরাম ঘাঁটি ত্যাগ করে আমেরিকা। আমেরিকার মতো সুপার পাওয়ারের আফগানিস্তানের মাটিতে এই ধরনের আচরণে বিশ্ব অবাক। এ ধরনের আচরণের আসল কারণ কী? নানা মুনির নানা মত। নিম্নে কিছু মত পেশ করা হলো—

একদলের মতে, আমেরিকা সত্যি সত্যিই আফগানিস্তানে সফল হয়নি। নিজেদের আর্থিক ক্ষতি কমিয়ে আনতে তারা এ ধরনের চুক্তি করে আফগান ত্যাগ করছে।

কারো মতে, আফগানিস্তানে নিকট অতীতে দায়িশ বা আইসিসের প্রভাব বিস্তার শুরু হচ্ছিল। আমেরিকা চায়নি যে, ইরাকের মতো আফগানের কোনো এলাকা আইসিসের হাতে চলে যাক। তাই তারা আইসিসের বিপরীতে তালেবানদের যোগ্য অলটারনেটিভ মনে করেছে। এই কারণের কিছুটা বাস্তবতাও আছে। তালেবানদের সাথে আইসিসের যুদ্ধের কিছু খবর গত দুই তিন বছরে পত্রিকার পাতাতেও এসেছে। এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, আমেরিকার নিকটে আইসিস ও তালেবান দুইটাই তো ইসলামপন্থী জঙ্গী, তাহলে কেন তাদের মধ্যে থেকে তালেবানকে বেছে নিল আমেরিকা? এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্লেষকগণ বলে থাকেন, তালেবানরা মূলত জাতীয়তাবাদী জিহাদী দল। তারা আফগান জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেয়। ফলত অন্য কোনো দেশ নিয়ে তাদের সার্বজনীন কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই।

কারো মতে, এই অঞ্চলে রাশিয়া-চীনের বাড়তি প্রভাব কমাতে তারা তালেবানকেই লটারির চাল হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে তালেবানদের উত্থানকে কাজে লাগিয়ে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে মুসলিম স্বাধীনতাকামীদের সহযোগিতা করতে চায় আমেরিকা। যাতে করে চীনকে অস্থিতিশীর পরিবেশের সম্মুখীন করা যায়। রোহিঙ্গাসহ তালেবানদের সহযোগিতায় রাশিয়া ও তার অনুগত দেশগুলোকে অস্থিতিশীল করে তোলার গোপন ইচ্ছা লালন করে আমেরিকা। হয়তো এই ধরনের মৌখিক কোনো চুক্তিও হয়ে থাকতে পারে তালেবান ও আমেরিকার মধ্যে।

অন্যদিকে বাহ্যিকভাবে দেখা যাচ্ছে, তালেবান কূটনৈতিকভাবে রাশিয়া, চীন ও পাকিস্তানকে এক প্রকার নিজেদের পক্ষে নিয়েছে। তালেবানরা পাকিস্তানকে এই মর্মে নিশ্চিত করেছে যে, তারা ক্ষমতায় আসলে আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করে কোনো জঙ্গী দলকে পাকিস্তানের মধ্যে কোনো ধরনের নাশকতা চালানোর সুযোগ দিবে না। আর এই কারণেই মূলত পাকিস্তানও আমেরিকাকে সেনাঘাঁটি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

www.al-itisam.com

যা আমেরিকা-পাকিস্তান সম্পর্ককে নতুন করে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। অন্যদিকে তারা চীনকে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, তাদের কোম্পানিগুলোর সহায়তাতেই আফগানিস্তানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা হবে। চীন হয়ে পাকিস্তানের বুক চিরে বালুচিস্তান হয়ে গোয়াদার গভীর সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত চীনের যে বিশাল প্রজেক্ট চলছে তার সাথে আফগানিস্তানও যুক্ত হবে। পেশোয়ার থেকে কাবুল ও কোয়েটা থেকে কান্দাহার উন্নতমানের যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তুলা হবে। জিনজিয়াং প্রদেশের স্বাধীনতাকামীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে ঘোষণা দিবে এবং তাদের নিয়ে কোনো ধরনের মাথা ঘামাবে না তালেবান। তালেবানরা ভারত ও রাশিয়াকেও নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে রাশিয়া-চীন তালেবানদের কথা বিশ্বাস করলেও ভারত বিশ্বাস করেনি বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। যার কিছুটা প্রভাব কাশ্মীরের রাজনীতিতে দেখা যাচ্ছে।

সবচেয়ে মজার বিষয় : আমাদের বাংলাদেশী মুসলিমদের অনেকেই যারা সবসময় সঊদী আরবের জাত উদ্ধার করতে ব্যস্ত থাকে এবং তুরস্কের এরদোগানকে সুলতান সোলেমান বা আরতুগ্রল মনে করে থাকেন। তাদের অধিকাংশই আবার আফগানিস্তানের তালেবানদের পক্ষাবলম্বন করে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে, আফগানিস্তানের মাটিতে বাঙ্গালীর স্বপ্নের সুলতান এরদোগান তালেবানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। সব বিদেশী সেনা চলে গেলেও তুরস্ক যেতে রাজী নয়। ন্যাটোর সাথে আসা একমাত্র দেশ হিসেবে তুরস্ক কাবুল বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে চায়। তুরস্কের এমন দাবিতে চরম ক্ষিপ্ত তালেবান। তালেবানরা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যতই মুসলিম দেশ হোক যদি তুরস্ক তার সেনাবাহিনী আফগানে রাখে, তাহলে তাদের সাথে সেই ব্যবহারই করা হবে, যা অন্য দখলদারদের সাথে করা হয়েছে; বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া হবে না। এদিকে বিশ্লেষকগণ বলছেন, শেষ পর্যন্ত তুরস্ক যদি আফগান ছাড়েও, তাহলেও প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তুরস্ক তার নিয়ন্ত্রিত সিরিয়ান মিলিশিয়া গ্রুপগুলোকে জিহাদের নামে আফগানিস্তান পাঠাবে এবং জিহাদের নাম দিয়েই তালেবানকে উচিত শিক্ষা দিবে। তুরস্কের এই ধরনের তৎপরতায় ফলাফল যেটাই আসুক, এতটুকু নিশ্চিত যে, তালেবানদের উত্থানের প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে পর্যন্ত থাকবে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তালেবানরা যেহেতু সুন্নী, সেহেতু অনেকেই ইরান-তুরস্ক নিয়ন্ত্রিত শীআ গ্রুপগুলোর বিপদ দেখতে পাচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে।

তালেবানের পরিকল্পনা কী?

যে তালেবানদের নিয়ে এত জল্পনা-কল্পনা তারা আসলে কী করবে? এই বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। তবে তাদের সাম্প্রতিক কালের কিছু কার্যক্রম দেখলে যে পরিকল্পনাগুলো স্পষ্ট হয় তা নিম্নরূপ :

আমেরিকা যে উত্তর ফ্রন্টকে কাজে লাগিয়ে তালেবানদের পতন ঘটিয়েছিল, তালেবানরা এই যাত্রায় সবার আগে সেই উত্তর ফ্রন্টের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিচ্ছে। এজন্যই বর্তমান বিজয়াভিযানের অধিকাংশই সংখ্যালঘু এলাকাগুলোতে পরিচালনা করছে। পশতু এলাকাগুলো অটোমেটিক তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তাই তারা প্রথমেই হাযারা শীআ, ইসমাঈলী শীআ, তাজিক, উজবেক, তুরক ইত্যাদি জাতি-গোত্র অধ্যুষিত এলাকাগুলো দখলে নিচ্ছে। যার ফলস্বরূপ উত্তর সীমান্তের বাদাখশান প্রদেশ ও গুরুত্বপূর্ণ ওয়াখান করিডোর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় তলেবান।

তাদের ইদানীং কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তা দেখলে মনে হয়, তাদের চিন্তায় এখন কোনোমতে ক্ষমতায় যাওয়া। ক্ষমতায় যেতে কাকে-কীভাবে নিশ্চয়তা দিতে হবে, সেটা তারা কূটনৈতিকভাবে অত্যন্ত সফলতার সাথে দিয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই তারা আমেরিকাপন্থী সকল রাজনীতিবিদ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। যার ফলে প্রচুর পরিমাণে আফগান বাহিনীর সদস্যরা তালেবানদের হাতে আত্মসর্মপণ করছে।

তাদের এই ধরনের কূটনৈতিক তৎপরতায় আরেকটি বিষয় ফুটে উঠে যে, তারা হয়তো আগেরবারের মতো আবেগী কোনো সিদ্ধান্ত নিবে না; বরং নিজেদেরকে জাতীয়তাবাদী পরিচয় দিয়ে আফগানিস্তানের অবকাঠামোগত উন্নয়নে মনোযোগ দিবে। এই রাস্তায় যদি তাদের কোনো কম্প্রমাইজ করতে হয়, তাহলে তারা হয়তো তাও করবে।

আমরা মহান আল্লাহর নিকট এতটুকু দু'আ করি— গত ৪০ দশক থেকে যুদ্ধের আগুনে পুড়তে থাকা আফগানিস্তানকে আর যেন কোনো যুদ্ধ দেখতে না হয়; না গৃহযুদ্ধ, না বাহিরের আক্রমণ। আফগানিস্তানে মহান আল্লাহ শান্তি ফিরিয়ে দিন! নিরীহ মুসলিম-মুসলিমার জানমাল ইজ্জত-আবরুর হেফাযত হোক- আমীন ইয়া রব্ব!

ছালাত : ঝামেলা নয়; আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা

-জাবির হোসেন*

বাস থেকে নেমে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আহমাদকে বললাম, ‘চল, ঝামেলার কাজটা আগে সম্পূর্ণ করে নিই’।

আমরা যাচ্ছি সালমানদা’র বাড়ি। গতকাল তাঁর বিয়ে হয়েছে। আজকে অলীমা। কয়েকদিন আগে আমাদের মেসে এসে ইনভাইট করে গেছে। আজকে যাচ্ছি, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

সালমানদা’র বাড়ি ডোমকল। ডোমকল বাসস্ট্যান্ড থেকে ট্রেকার যোগে আরও কিছুটা গিয়ে, তবেই তাদের বাড়ি। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে মেস থেকে বের হয়েছি। ডোমকল পৌঁছাতে বিকাল হয়ে গেল। বাসের মধ্যে থেকে আছরের আযান শুনতে পেয়েছি।

আহমাদ আমার দিকে তাকিয়ে রাগান্বিত হয়ে বলল, ‘ঝামেলার কাজ কোনটাকে বলছিস?’

আমি বললাম, ‘বুঝতে পারলি না—আরে! আমি আছরের ছালাতের কথা বলছি। এখানে একটা মসজিদ আছে— তা জানি। কয়েক বছর আগে এসেছিলাম। এখন যদি ছালাত আদায় না করি, তাহলে পরে অনেক ভারী মনে হবে’।

আহমাদ বলল, ‘তোর কাছে ছালাত আদায় করাটা ঝামেলার কাজ বলে মনে হলো’।

আমি বললাম, ‘না ভাই! যখন ছালাত আদায় করতেই হবে, তখন তাড়াতাড়ি করে নেওয়াটা ভালো নয় কি?’

‘রাইট! কিন্তু, তুই ছালাতকে ঝামেলার কাজ বললি কেন?’

‘আরে ইয়ার! আমি কী মন থেকে বলেছি, মুখ স্লিপ করে বেরিয়ে গেছে’।

‘আচ্ছা! তুই বলতো— আমরা কেন ছালাত আদায় করি?’

প্রশ্নটি আমাকে ভাবাতে শুরু করল। তাই তো, আগে কখনো তো ভাবিনি! আমি কেন ছালাত আদায় করি? আমি যখন পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র, তখন থেকে ছালাত পড়ি। কিন্তু, এই প্রশ্নটি তো কোনোদিন আমার মাথায় আসেনি।

আমতা আমতা করে বললাম, ‘ইসলামের একটি বড় ইবাদত হলো ছালাত— তাই’।

আহমাদ বলল, ‘হ্যাঁ, একথা সঠিক; তবে প্রশ্ন হলো, এই ইবাদত কেন করতে হবে?’

‘কেন আবার করতে হবে, সেই ছোটবেলা থেকে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের দেখে আসছি। গ্রামের মৌলানারা বলেন, মুসলিমদের ছালাত আদায় করতেই হবে— তাই আর কী! — মনে মনে বললাম। তবে মুখ ফুটে বলার সাহস হলো না। কী জানি— বললে আবার কী রকম ধমক দেয়!’

‘কী ভাবছিস?’ —আহমাদ বলল।

‘কই— কিছু না তো। তোর প্রশ্নটাই ভাবছিলাম। ভাই, আমার দ্বারা সম্ভব হলো না। তুই আমাকে বুঝিয়ে বল— কেন আমরা আল্লাহর ইবাদত করি?’

আমি জানি আহমাদ এ বিষয়টি আমাকে গুছিয়ে বলতে শুরু করবে। ও এমনই করে। তাই উত্তরের প্রত্যাশায়, মন দিয়ে তাঁর প্রতি চেয়ে থাকলাম।

আহমাদ বলতে শুরু করল, ‘তোর আব্বা-মা তোকে অনেক আদর যত্ন দিয়ে লালনপালন করেছে, তাই না?’

—‘হ্যাঁ’।

‘তোর সব অভাব-অভিযোগ পূরণ করেছে। তোর যখন যেটা প্রয়োজন, তখন তোকে তাই দিয়েছে। এখন তুই প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিস। এখন তুই যদি তোর বাবা-মায়ের খোঁজ খবর না নিস, তাঁদের যত্ন না করিস; তাদের কথা না শুনিস, তবে তোকে কী বলা হবে?’

আমি বললাম, ‘অমানুষ বা অকৃতজ্ঞ’।

‘ঠিক তেমনই— মহান আল্লাহ যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। শুধু আমাদেরই নয়, আমাদের পিতা-মাতাকেও সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর দয়া ও রহমত দিয়ে আমাদের পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন।

তিনি আমাদের দিয়েছেন জীবন। দিয়েছেন এই পৃথিবীর সমস্ত উপাদান, যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজন। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান।

তিনি দিয়েছেন সুপেয় পানি। যা পান না করলে কিছুদিনের মধ্যেই আমরা মারা যাব।

তিনি আমাদের দিয়েছেন অক্সিজেন, যা গ্রহণ করে আমরা বেঁচে

* এম. এ. (অধ্যয়নরত), বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

থাকি। মাত্র কয়েক মিনিট যদি আমরা বাতাস না পায় তাহলে...!

তাইতো মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ‘সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?’ *(আল-রহমান, ৫৫/১৩)*।

যিনি এতকিছু অনুগ্রহ দান করেছেন, তাঁর নির্দেশ মেনে না চলে যদি তাঁর বাণীকে উপেক্ষা করি এবং সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করি, তাহলে আমাদেরকে কী বলা হবে?

—অকৃতজ্ঞ নয় কি?

তারই জন্যে তো মহান আল্লাহ আমাদের অকৃতজ্ঞতা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, ‘মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ’ *(আল-হাজ্জ, ২২/৬৬; আয-যুখরুফ, ৪৩/১৫; আল-আদিয়াত, ১০০/৬)*।

মহান আল্লাহ চান, আমরা তাঁর ইবাদত করি এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলি। যেমনটি তিনি বলেছেন, ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ‘আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে’ *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*।

যদি আমরা আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর প্রশংসা করি— এতে তাঁর কোনো উপকার হবে না। কিন্তু, উপকার হবে আমাদের। উপকার হবে মানুষের। সেই সঙ্গে খুশি হবেন আমাদের প্রতিপালক’।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘কীভাবে?’

আহমাদ বলল, ‘একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। একজন ডাক্তার, যিনি গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন। এখন, একজন রোগী যদি ডাক্তারের পরামর্শ না শোনে এবং ডাক্তারের দেওয়া প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ সেবন না করে, তবে ডাক্তারের কেমন লাগবে? সে যদি নিজের ইচ্ছামতো ওষুধ খায়, তবে তার নিজেরই ক্ষতি হবে; এতে ডাক্তারের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু, যে ব্যক্তি ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলবে, তাঁর দেওয়া প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ সেবন করবে, এতে ডাক্তারবাবুর কোনো উপকার না হলেও উপকার হবে— সেই পেশেন্টের। এর পাশাপাশি ডাক্তারও খুশি হবেন এই ভেবে যে, তার রোগী সুস্থ হয়ে যাবে।

তাই আমরা যেন দৈহিকভাবে ও আত্মিকভাবে সুস্থ থাকি, তারই জন্য মহান আল্লাহ বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন: ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। আমরা যদি আল্লাহর ইবাদত না করি, তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না; আবার যদি ইবাদত করি, তাতে আল্লাহর কোনো উপকার হবে না। মহান আল্লাহ অমুখাপেক্ষী *(আল-ইখলাছ, ১১২/২)*। ইবাদত পালন করলে উপকার আমাদের, আর না করলে ক্ষতিও আমাদের।

ছালাত হলো ন্যায়পরায়ণতার ট্রেনিং। ছালাত হলো জীবন দর্শন। ছালাত আমাদের মনে প্রশান্তি আনে এবং দূর করে মলিনতা। ছালাত আমাদের ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপনের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নেয়। ছালাত আমাদের মধ্যে কর্তব্যবোধের শিক্ষা দেয়। ছালাত আমাদের মধ্যে ধনী-গরীব, ছোট-বড়, সাদা-কালোর ভেদাভেদ; গর্ব-অহংকার-আভিজাত্য সবকিছু দূর করে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একত্রে আদায় করতে বলে। ছালাত আমাদের অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

‘ছালাত প্রতিষ্ঠা করো। নিশ্চয় ছালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*।

আহমাদের এই মনোমুগ্ধকর বক্তব্যে শ্রোতার ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, ‘ভাই! তুই আমাকে অসাধারণ শিক্ষা দিলি’।

সত্যিই তো, ছালাত আমাদের জন্য ঝামেলা বা বোঝার কাজ নয়। ছালাত আমাদের স্বেচ্ছায় নিবেদিত আল্লাহর প্রতি ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। আমরা কত বড় অকৃতজ্ঞ বান্দা যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র এক ঘণ্টা সময় বের করতে কষ্ট হয়— স্রষ্টার প্রতি সিজদা নিবেদন করতে। অথচ আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিই, আড্ডা-ইয়ার্কি ও খেল-তামাশা করে।

আবার আমরা যারা ছালাত আদায় করি, তারা কেন ছালাত আদায় করতে হয়— সেটুকুও জানার চেষ্টা করি না। সত্যিই আমাদের....!

রাস্তার বাম পাশে একটি মসজিদ চোখে পড়ল। আহমাদকে বললাম, ‘ভাই চল, স্রষ্টার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আছরের ছালাত আদায় করে আসি’।

www.al-itisam.com

রাবী পরিচিতি-৬ : আবূ বকর ইবনু আবী মারইয়াম রাহিমাহুল্লাহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

উপক্রমিকা : রাবী অর্থ বর্ণনাকারী। যারা হাদীছ বা ঘটনা বর্ণনা করেন তাদের রাবী বলা হয়। রাবীদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কেউ ছহীহ হাদীছ বর্ণনাকারী। কেউ যঈফ হাদীছ বর্ণনাকারী। আবার কেউ কেউ আছেন যারা ইসলামের নামে জাল হাদীছ বানিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন। সুতরাং সব রাবীর হুকুম এক নয়। কোনো কোনো রাবীর দ্বারা ইসলামের উপকার হয়েছে। আবার কতিপয় রাবী দ্বারা ব্যাপক ক্ষতিও সাধিত হয়েছে। যঈফ রাবীদের তালিকায় থাকা অন্যতম একজন রাবী হলেন **আবূ বকর ইবনু আবী মারইয়াম**। নিম্নে তার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো—

নাম ও বিবরণ : أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ 'আবূ বকর ইবনু আবী মারইয়াম আল-গাসসনী'।[১] তিনি শামের অধিবাসী ছিলেন।[২] তার উপনাম বুকায়র। কারো কারো মতে, আব্দুস সালাম।[৩] ব্যক্তিজীবনে তিনি খুব ইবাদতগুজার মানুষ ছিলেন।[৪] তার জীবনী সম্পর্কে সঠিকসূত্রে তেমন কিছু জানা যায় না। তার জীবনী বিষয়ক তেমন কোনো তথ্য না থাকলেও তার কিছু উস্তাদ ও ছাত্রের তালিকা পাওয়া যায়।

উস্তাযগণ : তিনি তার পিতা, চাচাতো ভাই ওয়ালীদ ইবনু আবী সুফিয়ান, রাশেদ ইবনু সা'দ, যামরা ইবনু হাবীব, খালেদ ইবনু মা'দান, আতিয়্যা ইবনু ক্বায়স প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৫]

ছাত্রগণ : ছাত্রদের মধ্য হতে আবূল ইয়ামান, ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম, ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ, ইবনুল মুবারক, ঈসা ইবনু ইউনুস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন।[৬]

ইমামগণের মন্তব্য : তাঁর সম্পর্কে ইমামগণ বলেছেন—

(১) ইমাম জাওযাজানী (মৃ. ২৫৯ হি.) বলেছেন, أبو بكر بن أبي مريم ليس بالقوي في الحديث 'আবূ বকর ইবনু আবূ মারইয়াম হাদীছ বর্ণনায় শক্তিশালী রাবী ছিলেন না'।[৭]

(২) ইমাম নাসাঈ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেন, أَبُو بكر بن أبي مَرْيَم ضَعِيف 'আবূ বকর ইবনু আবী মারইয়াম যঈফ রাবী'।[৮]

(৩) ইবনু হাজার (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন, أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم الغساني الشامي وقد ينسب إلى جده قيل اسمه بكير وقيل عبد السلام ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط من السابعة مات سنة ست وخمسين 'আবূ বকর ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ মারইয়াম আল-গাসসানী আশ-শামী। তাকে তার দাদার দিকে সম্বন্ধ করা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম হলো বুকায়র। কারো কারো মতে, তার নাম আব্দুস সালাম। তিনি একজন যঈফ রাবী। তার বাড়িতে চুরি হওয়ার ফলে (কিতাবদি হারিয়ে) তার মাঝে ইখতিলাত্ব দেখা দেয়। অর্থাৎ হাদীছগ্রন্থ চুরি হওয়াতে হাদীছ বর্ণনায় ভুল করতে থাকেন)। তিনি ৭ম স্তরভুক্ত রাবী। তিনি ৫৬ হিজরীতে মারা যান'।[৯]

(৪) আলবানী (মৃ. ১৯৯৯ ইং) বলেছেন, وأبو بكر بن أبي مريم؛ ضعيف مختلط 'আবূ বকর ইবনু আবী মারইয়াম একজন যঈফ ও মুখতালিত্ব রাবী'।[১০]

প্রায় সকল ইমাম তাকে যঈফ রাবী বলেছেন। সুতরাং তিনি যঈফ রাবী এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তার বর্ণিত হাদীছ : তার বর্ণিত অনেক যঈফ হাদীছ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি নিম্নরূপ—

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ .... سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ.

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এমন একটা সময় আসবে যখন দীনার-দিরহাম ব্যতীত ব্যবহার করার মতো উপকারী আর কিছুই থাকবে না'।

তাখরীজ : হাদীছটি ইমাম আহমাদ,[১১] নুআঈম ইবনু হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন।[১২] মিশকাতেও হাদীছটি রয়েছে।[১৩]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এর রাবী আবূ বকর ইবনু আবী মারইয়াম একজন যঈফ রাবী। কিতাবাদি চুরি হয়ে যাওয়ার ফলে হাদীছ বর্ণনায় তার ভুল হতো, যা উপরে আলোচিত হয়েছে। আবার তিনি এখানে সরাসরি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি ছাহাবী ছিলেন না। অনেকে এই যঈফ হাদীছটি দিয়ে কাগুজে মুদ্রাকে হারাম বলার চেষ্টা করেন,[১৪] যা মোটেও ঠিক নয়। কেননা আবূ বকর যঈফ রাবী হওয়ার পাশাপাশি তিনি সূত্রবিহীনভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তাবেঈ হয়ে তিনি সরাসরি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, যা মুরসাল হাদীছ। আর মুরসাল হাদীছ সাধারণত যঈফ হয়ে থাকে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মাণ হলো, আবূ বকর ইবনু মারইয়াম একজন যঈফ রাবী। সুতরাং তার একক বর্ণনা সরাসরি গ্রহণ করা যাবে না। বরং যথাযথ তাহক্বীক্বের পর তা গ্রহণযোগ্য কিংবা পরিত্যাজ্য উভয়ই হতে পারে। -ওয়াল্লাহু আ'লাম।

১. তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ৭২৫৪।
২. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৯৭৪।
৩. তাহযীবুত তাহযীব, রাবী নং ১৩৯।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. তাহযীবুত তাহযীব, রাবী নং ১৩৯।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. আহওয়ালুর রিজাল, রাবী নং ৩০৮।
৮. আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন, রাবী নং ৬৬৮।
৯. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৯৭৪।
১০. যঈফা, হা/২৭২২, হা/৪১৯১।
১১. আহমাদ, হা/১৭২০১।
১২. আল-ফিতান, হা/৭১৮।
১৩. মিশকাত, হা/২৭৮৪, ২/১৯২।
১৪. দেখুন : ইমরান নজর হুসাইন, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, পৃ. ৩।

মুনাজাত

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক
ফারেগ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
বানারাস, ভারত।

প্রভু! মোদের পরে তব রহম-রং এঁকে দাও
ধূসর জীবনের গোধূলিতে তব সুর জাগিয়ে দাও।
মুছে দিয়ে পাপ, এ জীবন রাঙিয়ে দাও
বসন্ত ফুলের পরাগের রঙে রাঙিয়ে দাও।
যে সুরে, হিল্লোলে তব করুণা, সে সুর দাও
যে মেশে না এই মোহ কল্লোলে সে ঈমান-শক্তি দাও।
কঠিন পাপে, গভীর গহ্বরে না মোরে কাঁদাও
ব্যথার টানে এসেছি তব দ্বারে, না মোরে ফেরাও।
পরিকীর্ণ দিগন্ত সম তব দয়া, ক্ষমা-নীরদ দাও
আমি পন্থহারা পাপ কান্তারে পথ মোরে দেখাও।
মগজগলা রোদ্রে তব আরশ-ছায়া পাব, সে আমল দাও
'ইয়া লায়তানী কুনতু তুরাবা' কাঙাল বাণী না মোরে দাও।
সুহকান! সুহকান! ধিক্কার বাণী না তুমি শোনাও
কাওছারের পরশে পিয়াস বুঝিবে, সে আমল দাও।

পাহাড়ের বুকে

-মো. জহুরুল
হরিপুর, পোরশা, নওগাঁ।

এক ওমরের জান নিয়ে তোরা করবি কী বল শুনি?
হাজার ওমর তৈরি হওয়ার বীজ সে গেছে বুনি।
ফুঁ দিয়ে কভু যায় না নেভা ইসলামের এই বাতি,
বীজ কখনোও যায় না পেষা, চাপিয়ে বুকে মাটি।
আলো নেভাতে যাবে? আরও জ্বলে যাবে।
বুকে মাটি চাপা দিবে? আরও চারা গজাবে!
থামাবে বলো কীসে?
কিছুই হবে না, এক ওমরের প্রাণনাশে।
এক ওমরের গরহাজিরায় লক্ষ ওমর ছুটবে আজ।
কণ্ঠ চেপে ধরবে? শ্বাস রুদ্ধ হয়ে মরবে।
পারবে না নিতে বিজয়ী তাজ।
পাহাড়ের বুকে দেখবে আজি মুসলিমের কুচকাওয়াজ।
ষড়যন্ত্র করে যায়নি রুখা ইসলাম কভু কোনোখানে
ধ্বংস হয়েছে, ছুটেছে যারা ষড়যন্ত্রের ঐ পানে।
সময় এসেছে চলে এসো আজ ইসলামের এই ছায়াতলে
আল্লাহদ্রোহীরা ছাড়বে পাহাড়, পালাবে তারা দলবলে।

ঈমানের স্বাদ!

-মো. মেহেদী হাসান
প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ।

যখন দূর দিগন্তে সূর্যের রক্তিম আভা হারিয়ে যায়,
হৃদয়ের চোখে তাকালে দেখবে তুমি কত অসহায়!
ভালোবাসা যিনি দিলেন তারে না বাসিলে ভালো,
কত বোকা তুমি আঁধার নিলে ফিরিয়ে দিয়ে আলো!
দুনিয়ার মায়ায় আজ তুমি নিজেকে হারালে
ভেবে দেখো, কার কাছ থেকে তুমি পালালে!
দেখো গভীর নিশীথে প্রকৃতি থাকে সুপ্ত,
উঠে যাও রবের টানে হতে পারো তুমি মুক্ত!
রবের কাছে করো আকুতি, রোনাজারি আর ফরিয়াদ,
দিয়ো গো প্রভু মরণের সময় তাজা ঈমানের স্বাদ!

কল্যাণের দু'আ

-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ
মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

জানে না অনেকে সালামের মানে
কল্যাণের দু'আটা পৌঁছে আসমানে।
এই বাণী ওই রবের যিনি আসমানে,
মানুষের চাওয়াটার সব কিছু জানে।
তাই কেহ দিয়ো না সালামটা ছেড়ে,
জীবনকষ্ট তাতে যাবে খুব বেড়ে।

আযানের সুর

-শাকিব হুসাইন
খানসামা, দিনাজপুর।

মিনার থেকে ভেসে আসে
ওই আযানের সুর,
মিষ্টি কণ্ঠ শুনতে আহা!
কী যে সুমধুর।
রাত্রি শেষে ফজর হলে
ডাকে মুয়াজ্জিন,
ঘুমের চেয়ে ছালাত ভালো
ক্বায়েম করি দ্বীন।
আযানের সুর শুনে চলো
মসজিদেতে যাই,
আল্লাহ হলেন অদ্বিতীয়
তার বড় কেউ নাই।

বাংলাদেশ সংবাদ

নওমুসলিম উমার ফারূক হত্যা

গত ১৮ জুন বান্দরবানের তুলাছড়ি পাহাড়ে একজন নওমুসলিমকে গুলি করে হত্যা করা হয়। যিনি পূর্ণচন্দ্র ত্রিপুরা থেকে হয়েছিলেন উমার ফারূক। তিনি শুধু একজন নওমুসলিমই নন, তিনি একজন মসজিদের ইমাম ও দাঈ। ২০১৪ সালে তিনি নিজে ইসলাম গ্রহণ করেই থেমে থাকেননি, দ্বীন প্রচারের মিশনে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তার আশেপাশের অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং বিগত ৬ বছর ধরে তিনি বান্দরবানের বিভিন্ন গ্রামে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। জানা যায়, তার দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন ৩০টিরও অধিক পরিবার। এরপর উমার ফারূক একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন এবং এ লক্ষ্যে নিজের এক একর জমি মসজিদকে দান করেন। নিজেই সে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে তিনি সেখানে ওয়াক্তিয়া ছালাতের ইমামতি শুরু করেন। এক পর্যায়ে ২০১৮ সালে এই মসজিদে তিনি মাইক লাগিয়ে আযান দেওয়া শুরু করেন। ইসলাম বিদ্বেষী অপশক্তি ইসলাম গ্রহণ করার কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ তাকে হুমকি দিয়ে আসছিল। এই মাইক লাগানোর পর থেকে তার উপর নতুন করে প্রাণনাশের হুমকি শুরু হয়। এরপর গত ১৮ জুন রাত সাড়ে ৮টার দিকে মসজিদ থেকে ফেরার পথে সন্ত্রাসীরা তার বুকে এবং মাথায় গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। জানা যায়, পূর্ণচন্দ্র ত্রিপুরার বাবা বৌদ্ধ ধর্ম থেকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ২০১৪ সালে পূর্ণচন্দ্র ত্রিপুরা থানচিতে তার একজন উপজাতীয় মুসলিম বন্ধুর দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর বান্দরবানে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং উমার ফারূক নাম গ্রহণ করেন।

মাথাপিছু আয় ২ হাজার ২২৭ ডলার

অর্থনীতিতে বাংলাদেশ বর্তমানে ৪৩তম দেশ এবং দ্রুত বর্ধনশীল দেশসমূহের মধ্যে পঞ্চম। সারাবিশ্বে আর্থিক মন্দার প্রভাবে বেশিরভাগ দেশে প্রবৃদ্ধি অর্জন কমলেও ব্যতিক্রম বাংলাদেশ। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সবার চেয়ে উপরে বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি কমে তিন শতাংশে দাঁড়ালেও বাংলাদেশ সেক্ষেত্রে উল্টো দাপটের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রভাবে বেড়েছে মাথাপিছু আয়ও। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ৮৮ ইউএস ডলার, তখন বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ছিল ৬৭৬ টাকা। সে হিসেবে একজনের দৈনিক আয় ছিল ১ টাকা ৮৫ পয়সা। সেখান থেকে ক্রমাগতভাবে বেড়ে বর্তমানে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ১ লাখ ৯১ হাজার ৫২২ টাকা। দৈনিক হিসেবে প্রতিজন বর্তমানে ৫২৫ টাকা আয় করেন, যা আগের মাথাপিছু আয়ের তুলনায় ৯ শতাংশ বেড়েছে। বাংলাদেশের মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৯-৮০ পর্যন্ত গড়ে ২১ দশমিক ০৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৯-৯০ পর্যন্ত গড়ে ১১.২০%, ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্ত গড়ে ৭.২২%, ২০০০-০১ থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত গড়ে ৯.৯৬% এবং ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত গড়ে ১২.৩৩% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। মাথাপিছু আয় প্রসঙ্গে বিবিএস সূত্র জানায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলেই মাথাপিছু আয় বেড়েছে। জিডিপির প্রবৃদ্ধি সব সময় ইতিবাচক থাকায় ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে মাথাপিছু আয়। স্বাধীন দেশের শুরুতে যেখানে মাথাপিছু আয় ছিল ৬৭৬ টাকা, সেখানে মাত্র দুই যুগ পর (১৯৯৫-৯৬) সে মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়ায় ১১ হাজার ১৫২ টাকা। এর পরে ১৯৯৮-৯৯ সালে মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ হাজার ১৪৩ টাকা। এক ধাপে ২০০০-০১ সালে মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়ায় ২৩ হাজার ৯১ টাকা। এর পরে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৩৬ হাজার ৪৪৮ টাকা, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬৬ হাজার ৪৪ টাকা মাথাপিছু আয় হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে লাখ টাকা ছাড়ায় মাথাপিছু আয়। এই সময় মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ১ লাখ ১৪ হাজার ৬২১ টাকা। সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ১ লাখ ৬০ হাজার ৪৪০ টাকা। এখন মাথাপিছু আয় ২ হাজার ২২৭ ডলার।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

বিশ্বে দুর্ভিক্ষের মুখে ৪ কোটির বেশি মানুষ

বিশ্বে ৪৩টি দেশের ৪ কোটিরও বেশি মানুষের জন্য ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ বড় ধরনের হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ সুদান, সোমালিয়া এবং উত্তরাঞ্চলীয় নাইজেরিয়া বড় ধরনের দুর্ভিক্ষের মধ্যে রয়েছে। দক্ষিণ সুদানের ৭৫ লাখ মানুষ চরম দুর্ভিক্ষের মধ্যে রয়েছে। মূলত দেশটির দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পূর্ণ মানবসৃষ্ট। দুই দলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা সংঘাতের মধ্যস্থতা না হওয়ায় এই দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে সোমালিয়ার মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক খাদ্যাভাবে ভুগছে। দেশটির ৬২ লাখ মানুষ ক্ষুধা ও রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারানোর মতো হুমকির মুখোমুখি হয়েছে। আর কেনিয়ায় বর্তমানে ২৭ লাখ জনগণ শোচনীয় অবস্থায়

থাকলেও আগামী এপ্রিলের মধ্যে এই সংখ্যা ৪০ লাখে পৌঁছাতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সহিংসতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে অসতর্কতার কারণে কয়েক দশক বিরতির পর ২০১৬ সাল থেকে আবার বিশ্বজুড়ে ক্ষুধা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। বিশ্বের প্রায় ৬৯ কোটি মানুষ প্রতি রাতে ক্ষুধা নিয়ে ঘুমাতে যায়। এদিকে মৌলিক খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি এবছর খাদ্য নিরাপত্তাকে আরো নাজুক করে তুলেছে। খাদ্যের অভাবে বিশ্বে মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যার ব্যাপারেও শঙ্কা করা হচ্ছে।

মুসলিম বিশ্ব

দুবাইয়ে ছয় মাসে ২০২৭ জন মুসলিম হলেন

গত ছয় মাসে দুবাইয়ে দুই হাজারের বেশি লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তারা আগের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তারা দুবাইয়ে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের নাগরিক। দুবাইয়ের 'মুহাম্মাদ বিন রাশিদ সেন্টার ফর ইসলামিক কালচার' এক ঘোষণায় এই তথ্য প্রকাশ করে। এই বছরের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত দুই হাজার ২৭ জনের বেশি মানুষ এই সেন্টারে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। দুবাইয়ের ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড চ্যারিটেবল অ্যাক্টিভিটিস বিভাগের (আইএসিএডি) আওতাধীন এই কেন্দ্রটি নওমুসলিমদের ইসলামের উদার ও সহনশীল নীতিগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এছাড়াও তাদের সামাজিক, শিক্ষামূলক ও ধর্মীয় সহায়তা প্রদান করেছে। সেন্টারটি নতুন মুসলিমদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের ইসলামী সংস্কৃতি ও উদার-মহৎ শিক্ষার প্রসার ঘটাতে আগ্রহী করে তোলে। পাশাপাশি প্রকৃত ইসলাম ধর্মকে জানতে ইচ্ছুক এমন অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের কাছে ইসলামের নীতিগুলো ছড়িয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

যে গ্রামের সবাই ছালাত আদায় করে

পৃথিবীতে এমন একটি গ্রাম আছে, যার সবাই অন্য সবার চেয়ে আলাদা। তারা ছালাতের ব্যাপারে খুব যত্নবান। সবাই মিলে ছালাত পড়ার জন্য চেষ্টা করে এবং তারা এ ব্যাপারে শতভাগ সফল। গ্রামের কোনো দোকানে বা বাড়িতে টিভি নেই। ওই গ্রামের কেউ নেশা করে না। এমনকি সিগারেটও খায় না। পুরো গ্রামের দোকানগুলোতে গত ২০ বছর ধরে সিগারেট বিক্রিই করা হয় না। গ্রামে বিয়েশাদি হয় মসজিদে, সাদাসিধেভাবে। এক্ষেত্রে ইসলামী বিধানের পরিপূর্ণ লক্ষ রাখা হয়। বিয়ের মধ্যে গানবাজনা হয় না। কোনো বিয়েতে গানবাজনার ব্যবস্থা করা হলে সামাজিকভাবে ওই বিয়েকে বয়কট করেন সবাই। গ্রামের প্রতিটি কবর মাটির। ইটবালু দিয়ে পাকা করা হয় না। ওই গ্রামে কোনো ভিখারি নেই। সবাই কাজকর্ম করে উপার্জন করেন। গ্রামটি পাকিস্তানের ফয়সালাবাদে। জানা যায়, ওই গ্রামে ৯০ বছরের পুরোনো একটি মাদরাসা রয়েছে। যেখান থেকে সাধারণ মানুষকে ইসলামের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। যেকোনো ধরনের সমস্যা নিয়ে লোকজন মাদরাসায় হাযির হন আগে। ওই মাদরাসার প্রভাবেই পুরো গ্রামে এমন পরিবর্তন এসেছে বলে দাবি করেন মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আমীন। তিনি টানা ৪০ বছর ধরে ওই মাদরাসায় শিক্ষকতা করছেন। তিনি বলেন, আমাদের গ্রামের কোনো দোকানে বা বাড়িতে টিভি নেই। হাতেগোনা কয়েকটি বাড়িতে আছে। তবে আমাদের মাদরাসা থেকে তাদের বলে দেওয়া আছে, টিভি চালালেও ভলিউম কমিয়ে দেখতে হবে। কোনো পথচারী কোনো বাড়ি থেকে টিভির শব্দ শুনতে পেলে সাথে সাথে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং ওই বাড়িতে গিয়ে লোকজনকে বোঝান। এসব বিষয়ে গ্রামের কেউ কখনো বিতর্ক করেন না বলেও জানান তিনি। বরং দুঃখপ্রকাশ করে অসামাজিক বা অনৈসলামিক কাজ থেকে বিরত থাকেন।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

মঙ্গলের বাতাসে এবার অক্সিজেন তৈরি নাসার

মঙ্গলে প্রথমবারের মতো সফলভাবে অক্সিজেন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে মক্সি। উৎক্ষেপণের আগে মহাকাশযান পারসেভারেন্সের ভেতরে এটি স্থাপন করেছিল নাসা। মঙ্গলের বুকে সর্বশেষ এই সাফল্য অর্জনের একদিন আগেই আরেকটি বড় সাফল্য অর্জন করে নাসা। সৌরজগতের লোহিত গ্রহ মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের ৯৫ শতাংশই কার্বন ডাই-অক্সাইড। বাকি ৫ শতাংশ নাইট্রোজেন ও আর্গন। এর মধ্যে আর্গন হলো নিষ্ক্রিয় গ্যাস। মঙ্গলে অক্সিজেনও আছে, তবে তা উপেক্ষণীয় মাত্রায় কম। তারপরও এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব অনেক কম। সব মিলিয়ে রুক্ষ-শীতল গ্রহটি মানুষের বসবাসের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। তবে সেই বৈরী পরিবেশকে অনুকূল করার পথে এক ধাপ এগিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। তারা মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল থেকে কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করে তা শ্বাসযোগ্য বিশুদ্ধ অক্সিজেনে পরিণত করেছে।

www.al-itisam.com

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আশূরায়ে মুহাররম

প্রশ্ন (১) : আশূরায়ে মুহাররম গুরুত্বপূর্ণ কেন?

-আব্দুল গণি
কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

উত্তর : আশূরায়ে মুহাররমের গুরুত্বের মৌলিক কারণ হলো, এদিনে মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর ক্বওমকে অত্যাচারী বাদশাহ ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং তাকে ও তার লোকদেরকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বর্ণনা করেন, 'নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন তখন দেখতে পেলেন ইয়াহূদীরা আশূরা দিবসে ছিয়াম পালন করে। তাদেরকে ছিয়াম পালনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, এদিনই আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালাম ও বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের উপর বিজয় দিয়েছিলেন। তাই আমরা ঐ দিনের সম্মানে ছিয়াম পালন করি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদের চেয়ে আমরা মূসা আলাইহিস সালাম-এর বেশি হক্বদার। এরপর তিনি ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৪৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩০)। দ্বিতীয়ত, নাজাতে মূসার শুকরিয়াস্বরূপ এদিন ও তার পূর্বে একদিন ছিয়াম পালন করলে তা আল্লাহর নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গুনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হয় (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; মিশকাত, হা/২০৪৪)।

প্রশ্ন (২) : মুহাররমের ১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত ছিয়াম পালন করলে ৫০ বছরের নফল ছিয়ামের নেকী লেখা হয়। একথা কি ঠিক?

-আব্দুর রহমান
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে শুধু ৯ ও ১০ তারিখে ছিয়াম পালন করার ফযীলত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ 'আশূরার দিনের ছিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমার প্রত্যাশা, আল্লাহ এর দ্বারা পূর্বের বছরের সব (ছগীরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; মিশকাত, হা/২০৪৪)। উল্লেখ্য যে, ৫০ বছরের ছওয়াবের হাদীছ জাল (আল মাওযূআত লি ইবনিল জাওযী, ২/১৯৯)।

প্রশ্ন (৩) : আশূরা উপলক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহর করণীয় কী? মুহাররমের ছিয়াম কোন তারিখে রাখতে হবে?

-মাহমুদ
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : আশূরা উপলক্ষে করণীয় হলো, ১০ই মুহাররম ও তার পূর্বে এক দিনসহ মোট দুই দিন ছিয়াম পালন করা। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহূদী-নাছরারা ১০ই মুহাররম আশূরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশা-আল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররমসহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায় (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৪; মিশকাত, হা/২০৪১)।

প্রশ্ন (৪) : হুসাইনের হত্যার ব্যাপারে দায়ী কে? ইয়াযীদ, না-কি সীমার? সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-ইবরাহীম
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তর : অনেকেই হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু- এর হত্যার ব্যাপারে খলীফা ইয়াযীদকে দায়ী করে থাকেন। কিন্তু খলীফা ইয়াযীদের শাসনামলে ৬১ হিজরীর ১০ মুহাররম ইরাকের কারবালা নামক স্থানে হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে হত্যা করা হলেও তার হত্যার ব্যাপারে ইয়াযীদ দায়ী ছিলেন না। এমর্মে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, নিশ্চয় ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে হত্যার নির্দেশ দেননি। তিনি ওবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে কেবল ইরাক দখল করা হতে বাধা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন' (মাজমূউ ফাতাওয়া ৩/৪১১ পৃ.)। তিনি আরো বলেন, 'হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর স্ত্রী-পুত্রগণ যখন ইয়াযীদের নিকট পৌঁছলেন, তখন তিনি তাদের অনেক সম্মান করেছেন এবং নিরাপত্তার সাথে তাদেরকে পুনরায় মদীনায় পৌঁছে দিয়েছেন' (প্রাগুক্ত)। ইতিহাসগ্রন্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হত্যার ব্যাপারে প্রকৃত দোষী দুইজন। ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ও সীমার। কারণ কূফাবাসীর বায়'আত গ্রহণের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যখন তিনি তথায় আগমন করেন এবং তার সাথে বেঈমানী করত তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্দত হয়, তখন ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ কূফার গভর্নর ছিল এবং সে সরাসরি যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল।

আর সীমার সরাসরি হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮/২১৪ পৃ.)। উল্লেখ্য যে, হুসাইনের শাহাদাত বরণের সাথে আশুরায়ে মুহাররমের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই (ইবনু হাজার আসক্বালানী, দারুল ইছাবা, ১/৩৩১ পৃ.)।

প্রশ্ন (৫) : ১০ই মুহাররম শীআরা যে তা'যিয়া মিছিলের আয়োজন করে তাতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি? এতে যোগ দেওয়ার পরিণাম কী?

-হারুনুর রশীদ
কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

উত্তর : না, তাতে যোগ দেওয়া যাবে না। কেননা তা'যিয়া অর্থ বিপদে সান্ত্বনা দেওয়া। অথচ সেটা বর্তমানে শাহাদাতে হুসাইন-এর শোক মিছিল হিসাবে রূপ নিয়েছে। তাছাড়া ইসলামে কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা নিষেধ। আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জা'ফরের সন্তানদেরকে (জা'ফর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর শাহাদাতের জন্য) শোক প্রকাশের তিন দিন সময় দিলেন। অতঃপর তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এলেন এবং বললেন, 'আজকের পর হতে তোমরা আর আমার ভাইয়ের জন্য কান্নাকাটি করবে না' (আবূ দাঊদ, হা/৪১৯২; নাসাঈ, হা/৫২২৭; মিশকাত, হা/৪৪৬৩)। কিন্তু বাগদাদের গোঁড়া শীআ আমীর 'মুইযযুদ্দৌলা' ৩৫২ হিজরীর ১০ই মুহাররমকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেন এবং শহর ও গ্রামের সকলকে তা'যিয়া মিছিলে যোগদানের নির্দেশ দেন। সেদিন থেকেই এই বিদআতী প্রথা চালু হয়েছে। প্রত্যেক আল্লাহভীরু মুসলিমের এসব বিদআত হতে দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা বিদআতীর আমল কবুল হয় না এবং তার পরিণাম জাহান্নাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল, যার ব্যাপারে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮; ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা হতে বিরত থাকো। কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী (আহমাদ, হা/১৬৬৯৪; আবূ দাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী, হা/২৬৭৬, ইবনু মাজাহ, হা/৪২, মিশকাত, হা/১৬৫)। নাসাঈর এক বর্ণনায় এসেছে, 'প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম' (নাসাঈ, হা/১৫৭৮)।

ইবাদত--ছালাত

প্রশ্ন (৬) : ছালাতুল ইশরাক কি প্রতিদিন পড়তে হবে? এ ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত কী?

-গোলাম মোস্তফা
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : ছালাতুল ইশরাক নফল বা অতিরিক্ত ছালাত। নফল ছালাত প্রতিদিন নিয়মিত পড়া উত্তম। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো, যা সদাসর্বদা নিয়মিত করা হয় যদিও তা অল্প হয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৬৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৮৩; মিশকাত, হা/১২৪২)। কিন্তু আবশ্যক নয়। কেননা ফরয বিধানগুলোই শুধু আবশ্যকতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, নফলগুলো নয়। ত্বালহা ইবনু উবায়দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজদবাসীর একজন লোক এলোমেলো কেশে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলো। আমরা তার ফিসফিস শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু বেশ দূরে থাকার কারণে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এমনকি সে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুব নিকটে এসে পৌঁছল। সে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল (ইসলাম কী?), রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা। তখন সে লোকটি বলল, এছাড়া কি আর কোনো ছালাত আমার উপর ফরয? তিনি বললেন, না। তবে তুমি নফল ছালাত আদায় করতে পারো... (ছহীহ বুখারী, হা/৪৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১; মিশকাত, হা/১৬)। ছালাতুল ইশরাকের অনেক গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ ، وَعُمْرَةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামাআতে আদায় করবে অতঃপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর যিকির করতে থাকবে, (সূর্য উঠার পরে) দুই রাকআত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য পূর্ণ হজ্জ ও উমরার সমপরিমাণ নেকী হবে' (তিরমিযী, হা/৫৮৬; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩৪০৩; মিশকাত, হা/৯৭১)।

প্রশ্ন (৭) : ছালাতের বহু পরে স্মরণ হচ্ছে যে, ওয়াজিব সাহু সিজদাটি দেওয়া হয়নি। এমতাবস্থায় করণীয় কী?

-মারুফ হোসেন
কাউখালী, পিরোজপুর।

উত্তর : সাহু সিজদা দিতে ভুলে গেলে ছালাত বাতিল হয় না। তাই সালাম ফেরানোর অল্প সময়ের মধ্যে স্মরণ হলে দুটি সিজদা দিয়ে নিতে হবে। যদি দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পরেও স্মরণ হয় তবুও সাহু সিজদা দিয়ে নেওয়া ভালো (ছহীহ বুখারী, হা/১২২৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭৩)। তবে না দিলেও ছালাতের ক্ষতি হবে না (আল মুগনী, ১/৩৮৫)।

প্রশ্ন (৮) : সবসময় টাখনুর উপরে প্যান্ট গুটিয়ে পরার অভ্যাস হেতু ছালাতের সময়ও যদি তা গুটানো থাকে তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে?

-আব্দুর রহমান সাকিব
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ছালাতের সময় কাপড় গুটিয়ে রাখা যাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমাকে সাত অঙ্গের ভরে সিজদা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এ কথা বলে তিনি নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু ও পায়ের দুই পাতার দিকে ইশারা করলেন। আর কাপড় ও চুল গুটিয়ে না রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে' (ছহীহ বুখারী, হা/৮১২; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯০; মিশকাত, হা/৮৮৭)। ছালাতের মধ্যে যেহেতু কাপড় গুটিয়ে রাখা যায় না, তাই ছালাতের বাইরেও কাপড় গুটিয়ে না পরার চেষ্টা করতে হবে। কারণ ছালাতের বাইরে গুটিয়ে পরলে ছালাতের সময় গুটানো ছাড়া কোনো পথ থাকে না।

প্রশ্ন (৯) : চার রাকআতবিশিষ্ট ছালাতের দুই রাকআত পড়ে ভুলে সালাম ফিরালে পুনরায় কি ঐ ছালাত শুরু থেকে পড়তে হবে?

-আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর : না, পুনরায় ঐ ছালাত শুরু থেকে পড়তে হবে না। বরং রাকআত কম হয়েছে এটা জানার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত ছালাত আদায় করে নিবে। অতঃপর দুই দিকে সালাম ফিরিয়ে দুটি সাহু সিজদা দিবে। চাইলে আবার দুই দিকে সালাম ফিরাতে পারে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার আমাদের বিকালে ছালাতে ইমামতি করলেন। ইবনু সীরীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকআত ছালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর মসজিদে রাখা এক টুকরা কাঠের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন। আর তাঁর ডান গাল বাম হাতের পিঠের উপর রাখলেন। যাদের তাড়া ছিল তারা মসজিদের দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। ছাহাবীগণ বললেন, ছালাত কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে? উপস্থিত লোকজনের মধ্যে আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এবং উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-ও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। লোকজনের মধ্যে লম্বা হাতওয়ালা এক ব্যক্তি ছিলেন, যাকে 'যুল-ইয়াদাইন' বলা হতো, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুল করেছেন, না ছালাত সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? তিনি বললেন, আমি ভুলও করিনি, আবার ছালাত সংক্ষিপ্তও করা হয়নি। এরপর (অন্যদের) জিজ্ঞেস করলেন, যুল-ইয়াদাইনের কথা কি ঠিক? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি এগিয়ে এলেন এবং ছালাতের বাদ পড়া অংশটুকু আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বললেন ও স্বাভাবিকভাবে সিজদার মতো বা একটু দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। পরে আবার তাকবীর বললেন ও স্বাভাবিকভাবে সিজদার মতো বা একটু দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। লোকেরা প্রায়ই ইবনু সীরীন (রাহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করত 'পরে কি তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন?' তখন ইবনু সীরীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলতেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেছেন, তারপর তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৮২; ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৭)।

প্রশ্ন (১০) : ছালাতের শেষ বৈঠকে পা বিছিয়ে দিয়ে নিতম্ব মাটিতে রেখে বসতে হয়। জামাআতে ছালাত আদায় করার ক্ষেত্রে যদি রাকআত ছুটে যায়, সেক্ষেত্রে আমি কোন বৈঠককে আমার সালামের বৈঠক হিসেবে গণ্য করব? ইমামের সালামের বৈঠককে, না-কি আমি যে বৈঠকে সালাম ফিরাব সেই বৈঠককে? অর্থাৎ আমি কোন বৈঠকে নিতম্ব মাটিতে রেখে বসব?

-মিরাজুল ইসলাম
বাগেরহাট।

উত্তর : এমতাবস্থায় ইমামের অনুসরণ করত তাওয়াররুক করে (নিতম্বের ভরে) বসতে হবে। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৪১১; মিশকাত, হা/১১৩৯)।

প্রশ্ন (১১) : মসজিদে জামাআত চলছে। সেই জামাআতের অনুসরণ করে মহিলারা বাড়ি থেকে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : মহিলারা জামাআতে শরীক হতে চাইলে মসজিদে তাদের জন্য ছালাতের ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর বান্দিদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না (ছহীহ বুখারী, হা/৯০০; মুসলিম, হা/৪৪২)।

www.al-itisam.com

তবে মসজিদে ব্যবস্থা না থাকলে তারা বাড়ি থেকেও মসজিদের ইমামের অনুসরণ করে জামাআতে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে অবশ্যই তাদেরকে ইমামের ডানে, বামে, উপর অথবা পিছন হতে ইক্বতিদা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই আগে যেতে পারবে না। দূর থেকে ইমামের অনুসরণ করা যায় মর্মে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ একটি অধ্যায় রচনা করে বলেছেন, 'যখন ইমাম এবং জাতির মাঝে দেওয়াল বা সুতরা থাকবে'। হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তোমার ও মুক্তাদির মাঝে নদী থাকলেও সমস্যা নেই'। আবূ মিজলায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুক্তাদি যদি ইমামের তাকবীর শুনতে পায় তাহলে সে তার অনুসরণ করতে পারবে যদিও তাদের মাঝে রাস্তা বা দেওয়াল থাকে' (ছহীহ বুখারী, অধ্যায় নং-৮০)। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তার কক্ষে ছালাত আদায় করছিলেন। ঘরের দরজাটি ছোট ছিল যার ফলে মানুষরা তাঁর শরীর দেখতে পেতেন। তখন তারা (দেওয়ালের পেছন থেকেই) তাঁর সাথে ছালাত আদায় করতে আরম্ভ করেন... (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৯)।

প্রশ্ন (১২) : ছালাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়লে ছালাত হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
রানীরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শুধু সূরা ফাতেহা পড়াই যথেষ্ট। কেননা ছালাতে সূরা ফাতেহা পড়া ফরয। যদি কেউ তা পাঠ না করে তাহলে তার ছালাত হবে না। উবাদা ইবনু ছামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতে সূরা ফাতেহা পড়ল না তার ছালাত হলো না' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৬; মিশকাত, হা/৮২২)। আর অতিরিক্ত ক্বিরআত করা সুন্নাহ। ছালাতের সুন্নাহ ছেড়ে দিলে ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে, তবে ছওয়াব কম হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক ছালাতেই ক্বিরআত পড়া হয়। তবে যেসব ছালাত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের শুনিয়ে পড়ব। আর যেসব ছালাতে আমাদেরকে না শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদেরকে না শুনিয়ে পড়ব। যদি তোমরা সূরা ফাতেহার পরে আরো অধিক আয়াত পাঠ না কর তবুও ছালাত হয়ে যাবে। আর যদি অধিক আয়াত পাঠ কর তাহলে সেটাও তোমার জন্য উত্তম হবে (ছহীহ বুখারী, হা/৭৭২; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৬)।

উল্লেখ্য যে, ছালাত হয়ে যাবে মনে করে ফাতেহার সাথে অন্য সূরা পাঠ না করা সুন্নাহ বহির্ভূত আমল।

প্রশ্ন (১৩) : জনৈক ব্যক্তি মিশকাতে বুরায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মাগরিবের আযানের পর দুই রাকআত সুন্নাত পড়া যাবে না। কেননা আযান ও ইক্বামতের মাঝে যে দুই রাকআত সুন্নাত আদায়ের কথা এসেছে তা মূলত মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য ছালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কথা কি ঠিক?

-আহমাদ
শ্যামপুর, রাজশাহী।

উত্তর : বুরায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে বাতিল বলেছেন (আলবানী, মিশকাত, হা/৬৬২-এর ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দুই রাকআত ছালাত আদায় করো'। ...তৃতীয়বারে তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে' (ছহীহ বুখারী, হা/১১৮৩ মিশকাত, হা/১১৬৫)। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা মদীনায় ছিলাম। মুয়াজ্জিন মাগরিবের ছালাতের আযান দিলে তারা তাড়াহুড়া করে স্তম্ভের নিকট গিয়ে দুই রাকআত ছালাত আদায় করতেন। এমনকি কোনো আগন্তুক মসজিদে প্রবেশ করলে অধিক সংখ্যক ছালাত আদায়কারীর কারণে তার মনে হতো যে, (ফরয) ছালাত শেষ হয়ে গেছে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৩৭)। আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল আল-মুযানী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রতি দুই আযানের মাঝখানে ছালাত আছে। তিনি কথাটি তিন বার বলেন, তৃতীয় বারে তিনি বলেন, যে তা আদায় করতে চায় তার জন্য (ছহীহ বুখারী, হা/২২৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৩৭)।

প্রশ্ন (১৪) : মসজিদের ভেতরে খত্বীবের বাম পাশে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া ঠিক হবে কি?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : আযান অর্থ এ'লান করা বা ঘোষণা দেওয়া। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যে, ছালাতের সময় আরম্ভ হয়ে গেছে। সুতরাং উচ্চ আওয়াযে এমন স্থান থেকে আযান দেওয়া জরুরী যেন তার শব্দ ও বাক্যসমূহ মানুষের নিকট পৌঁছায়। আর এজন্যই বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দিতেন। নাজ্জার গোত্রের জনৈক মহিলা ছাহাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মসজিদে নববীর নিকটবর্তী ঘরসমূহের মধ্যে আমার বাড়ি ছিল সুউচ্চ। বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানে উঠে

ফজরের আযান দিতেন (আবূ দাঊদ, হা/৫১৯)। যদি এমন কোনো ব্যবস্থা না থাকে তাহলে মসজিদের যে কোনো স্থান থেকে আযান দিতে পারে।

প্রশ্ন (১৫) : نَوْمُ الْعَالِمِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ 'মূর্খের ইবাদতের চেয়ে আলেমের ঘুম উত্তম' হাদীছটি কি ছহীহ?

-আবিদা সুলতানা
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : এটা রাসূলের কোনো হাদীছ নয় এবং কোনো ছাহাবী ও তাবেঈর আছারও নয়। বরং তা শীআদের লিখিত কিতাব 'মান লা ইয়াহযুরুহুল ফক্বীহু'-এ বর্ণিত একটি মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীছ মাত্র। এই বানোয়াট হাদীছটি সুনানের কোনো গ্রন্থেও উল্লেখ নেই। এই হাদীছের বর্ণনাকারীদ্বয় হলো- হাম্মাদ ইবনু আমর ও আনাস। যারা অপরিচিত ('মান লা ইয়াহযুরুহুল ফক্বীহু' পৃ. ১/৫৩৬; মুজামু রিজালিল হাদীছ পৃ.৭/২৩৫)।

ইবাদত--ছিয়াম

প্রশ্ন (১৬) : জনৈকা বৃদ্ধার ছিয়াম রাখার মতো শারীরিক শক্তি এবং ফিদইয়া দেওয়ার মতো সামর্থ্য নেই। এমতাবস্থায় তার করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : এমতাবস্থায় তাকে ফিদইয়া আদায় করতে হবে না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি বললেন, কীসে তোমাকে ধ্বংস করেছে? সে বলল, আমি রামাযানে ছওমরত অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন, তোমার কোনো ক্রীতদাস আছে কি, যাকে তুমি আযাদ করে দিতে পার? সে বলল, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ক্রমাগত দুই মাস ছিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। পুনরায় নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। তারপর সে বসে গেল। এরপর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক টুকরি খেজুর আনা হলো। তিনি লোকটিকে বললেন, এগুলো ছাদাক্বা করে দাও। তখন সে বলল, আমার চেয়েও অভাবী লোককে ছাদাক্বা করে দিব? (মদীনার) দুটি কঙ্করময় ভূমির মধ্যস্থিত স্থানে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবী পরিবার আর একটিও নেই। এ কথা শুনে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। এমনকি তার সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন তিনি বললেন, তাহলে যাও এবং এগুলো তোমার পরিবারকে খেতে দাও (ছহীহ বুখারী, হা/৬৭১১; ছহীহ মুসলিম, হা/১১১১)। এমতাবস্থায় তার অভিভাবক বা অন্য কেউ দিতে পারে কি-না দেখতে হবে। সম্ভব না হলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে।

ইবাদত--যাকাত

প্রশ্ন (১৭) : আমার ১৩ শতাংশ জমি আছে। জমিটি আমার বাবা চাষাবাদ করেন এবং উৎপন্ন ফসলাদি তিনিই ভোগ করেন। আমি চাকরির প্রয়োজনে বাইরে থাকি। এমতাবস্থায় উক্ত জমি বা ফসলাদির জন্য আমাকে যাকাত বা উশর দিতে হবে কি?

-আব্দুল ওয়ারেছ
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : যিনি জমি চাষ করবেন তাকেই উশর দিতে হবে। এটাই যাকাতুল উশরের মূলনীতি (আল-মুগনী, ৩/৩০)। তাই প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে পিতাকেই উশর দিতে হবে।

ইবাদত--দান-ছাদাক্বা

প্রশ্ন (১৮) : জনৈক ব্যক্তি ছালাত, ছিয়াম, ও দান-ছাদাক্বা করে। কিন্তু তার আচরণে মানুষ কষ্ট পায়। এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য কী?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : নবীগণকে পাঠানোর অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মাঝে উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা ও তাদের উত্তম আদর্শে আদর্শিত করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে' (আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহাইন, হা/৪২২১)। প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তি সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য হলো, তার এই আচরণ তার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে। এমর্মে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অমুক মহিলা বেশি বেশি ছালাত আদায় করে, ছিয়াম রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিহ্বা দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, 'সে জাহান্নামে যাবে'। লোকটি আবারও বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অমুক মহিলা কম ছালাত আদায় করে, ছিয়াম রাখে এবং দান-খয়রাত

www.al-itisam.com

করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিহ্বা দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, 'সে জান্নাতে যাবে' (মুসনাদে আহমাদ, হা/৯৬৭৩)। সুতরাং এমন আচরণ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

মৃত্যু ও জানাযা

প্রশ্ন (১৯) : গর্ভচ্যুত বাচ্চার জানাযার বিধান কী?

-আকীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি কেঁদে উঠে, হাঁচি দেয় বা প্রাণ ছিল বলে বুঝা যায় অতঃপর মারা যায় তাহলে তার জানাযা দিতে হবে। আর মৃত জন্ম নিলে জানাযা দিতে হবে না। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জন্মের পর কেঁদে না উঠা পর্যন্ত শিশুর জানাযা নেই। আর সে কারো ওয়ারিছ হবে না এবং তার থেকেও কেউ ওয়ারিছ হবে না (ইবনু মাজাহ, হা/২৭৫১; তিরমিযী, হা/১০৩২; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৫২)।

প্রশ্ন (২০) : মহিলা ও পুরুষের জানাযার ছালাতে ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন?

-আকীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : জানাযার ছালাতে ইমাম পুরুষের মাথা বরাবর এবং মহিলার মাঝ বরাবর দাঁড়াবে। নাফে' আবূ গালিব রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর সাথে এক জানাযায় (আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর) ছালাত আদায় করেছি। তিনি (জানাযার) মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। এরপর লোকেরা কুরাইশ বংশের এক মহিলার লাশ নিয়ে এলেন এবং বললেন, হে আবূ হামযা! এই মহিলার জানাযার ছালাত আদায় করে দিন। (এ কথা শুনে) আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু খাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জানাযার ছালাত আদায় করে দিলেন। এটা দেখে আলা ইবনু যিয়াদ বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এভাবে দাঁড়িয়ে জানাযার ছালাত আদায় করতে দেখেছেন, যেভাবে আপনি এ মহিলার ছালাত মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও পুরুষটির জানাযা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ালেন? আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ দেখেছি (তিরমিযী, হা/১০৩৪; ইবনু মাজাহ, হা/১৪৯৪; নাসাঈ, হা/১৯৭৯; মিশকাত, হা/১৬৭৯)।

প্রশ্ন (২১) : এক লেকচারে শুনেছি, স্বামী মারা গেলে স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন কোনো গহনা পরতে পারবে না; পরিহিত সকল গহনা খুলে ফেলতে হবে; বাবার বাড়ি বা অন্য কোথাও যেতে পারবে না ইত্যাদি। কথাগুলো কি ঠিক?

-ফাহমিদা সুলতানা
কেশরহাট, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ, কথাগুলো ঠিক। তবে স্বামী মারা যাওয়ার পরপরই পরিহিত গহনা খুলে ফেলতে হবে এমন কথা হিন্দুয়ানী প্রথা। নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হলো, (১) চার মাস দশ দিন বিবাহ করতে পারবে না (ছহীহ বুখারী, হা/ ৫৩৪২)। (২) কোথাও যেতে পারবে না (আত-তালাক, ৬৫/১)। (৩) সাজগোজ করতে পারবে না। (৪) সুগন্ধি ব্যবহার করবে না (ছহীহ বুখারী, হা/১২৮০)।
উল্লেখ্য যে, স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হয়। আর তাদের ইদ্দতের সময়কাল চার মাস দশ দিন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা গেছে তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত নিজেদের বিরত রাখবে' (আল-বাক্বারা, ২/২৩৪)। তবে গর্ভবতী থাকলে তাদের ইদ্দত হলো, সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। মহান আল্লাহ বলেন, গর্ভবতীদের সময়কাল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত (আত-তালাক, ৬৫/৪)। উম্মু আত্বিয়্যাহ (নুসায়বা) রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো রমণী যেন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন না করে, অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে ৪ মাস ১০ দিন ব্যতীত। এছাড়া সে যেন রং করা সুতার কাপড় ছাড়া কোনো রঙিন কাপড় না পরে, সুরমা না লাগায় ও সুগন্ধি ব্যবহার না করে। অবশ্য ঋতুস্রাব হতে পাক হওয়ার সময় (শরীরের দুর্গন্ধ দূরীকরণে) 'কুস্ত্ব' ও 'আযফার' জাতীয় কাঠের সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৪২; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৩৮; মিশকাত হা/৩৩৩১)।

আখেরাত

প্রশ্ন (২২) : একজন মহিলার মাঝে কী কী গুণ থাকলে জান্নাতে যেতে পারবে?

-শারমিন সুলতানা
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোনো মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করলে, রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করলে, লজ্জাস্থানের হেফাযত করলে ও স্বামীর আনুগত্য করলে সে জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে' (আল-হিলইয়া, মিশকাত, হা/৩২৫৪)।

প্রশ্ন (২৩) : জান্নাতী মহিলাদের সর্দার কে হবে?

-আবু বকর
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : জান্নাতী মহিলাদের সর্দার হবেন ফাতেমা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাতেমা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে চুপে চুপে বলেছিলেন যে, তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে তিনিই (ফাতেমা) সর্বপ্রথম তাঁর অনুসরণ করবেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৬২৬; মিশকাত, হা/৬১২৯); এবং তিনি জান্নাতী নারী অথবা ঈমানদার নারীদের সর্দার হবেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬২৮৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৫০; মিশকাত, হা/৬১২৯)। উল্লেখ্য যে, জান্নাতী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারী হবেন চার জন। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটিতে চারটি দাগ কাটলেন এবং বললেন, তোমরা কি জানো এটা কী, এর মর্মার্থ কী? তারা বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর তিনি বললেন, জান্নাতী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারী হলো খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতু মুহাম্মাদ, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতু মাযাহেম এবং মারইয়াম বিনতু ইমরান (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম) (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬৬৮; সিলসিলা ছহীহ, হা/১৫০৮)।

প্রশ্ন (২৪) : 'যৌতুক নিয়ে বিবাহ করলে তাকে কিয়ামতের মাঠে যেনাকারীদের কাতারে দাঁড় করিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'-এমন কথার শারঈ কোনো ভিত্তি আছে কি?

-হারুন
নীলফামারী।

উত্তর : না, এমন কথার শারঈ কোনো ভিত্তি নেই। তবে যৌতুক দাবি করা গর্হিত অপরাধ। এটি হিন্দু সমাজ থেকে আসা কুসংস্কৃতি। হিন্দুরা বিয়ের দিনেই মেয়েকে যা দেওয়ার দিয়ে দেয়। মীরাছ থেকে কোনো কিছু দেয় না। এই প্রথা মুসলিমদের মাঝে ঢুকে পড়েছে। এটি কনের পরিবারের উপর জঘন্য অত্যাচার। শরীআতে যা সম্পূর্ণ হারাম। জানা আবশ্যক যে, বরের পক্ষ থেকে কনেকে সন্তুষ্টচিত্তে মোহর প্রদান করতে হবে। কনে পক্ষের কাছ থেকে নেওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা রমণীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে মোহর প্রদান করো' (আন-নিসা, ৪/৪)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমরা তাদেরকে ভালোভাবে মোহর প্রদান করো' (আন-নিসা, ৪/২৫)। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে গ্রহণ করো' (আন-নিসা, ৪/২৪)। মূলত বিবাহের আদেশ দেওয়া হয়েছে পুরুষের সামর্থ্যের উপর। যার সামর্থ্য নেই সে বিবাহ করবে না (ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৫; মিশকাত, হা/৩০৮০)। তবুও যৌতুক নিতে পারবে না। এমনকি বাসর রাতের পর পুরুষকেই ওয়ালীমা করার দায়িত্ব পালন করতে হবে (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৫৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪২৭; মিশকাত, হা/৩২১০); আর স্ত্রীর থাকা-খাওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব পুরুষকেই বহন করতে হবে (ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; মিশকাত, হা/২৫৫৫)। বিবরণে স্পষ্ট হয় যে, বিবাহের পর থেকে সর্ব সময়ে স্বামীকে সকল খরচ বহন করতে হবে। মেয়ের পিতাকে বহন করতে হবে না। অতএব, যৌতুক আদান-প্রদান করা থেকে সর্বাত্মকভাবে বিরত থাকা জরুরী। উল্লেখ্য যে, বিয়ের পর সাংসারিক সুবিধার জন্য কনের পিতা যদি স্বেচ্ছায় তার মেয়েকে কিছু দেয় তাহলে সেটি যৌতুক হবে না। অনুরূপভাবে জামাই কৌশল করে কিছু গ্রহণ করলেও তা জায়েয হবে না। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার মেয়ে ফাতেমা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে বলেছিলেন, 'আমার সম্পদ থেকে যা খুশি চাও, কিন্তু পরকালে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না' (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৫৩; মিশকাত, হা/৫৩৭৩)। তাছাড়া ফাতেমা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে খাদেম চাইতে গিয়েছিলেন। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন তাকে বলেননি যে, বাবার পক্ষ থেকে মেয়েকে কিছু দেওয়া জায়েয হবে না (আবূ দাঊদ, হা/২৯৮৮)।

দু'আ ও যিকির-আযকার

প্রশ্ন (২৫) : সূরা আলে ইমরানের প্রথম দুই আয়াত সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করলে ৭০ হাজার ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করে। কথাটি কি সত্য?

-নাজনীন পারভীন
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : না, এ ধরণের বর্ণনা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোথাও পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (২৬) : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়াহুওয়া হায়য়ুন, লা- ইয়ামূতু, বিয়াদিহিল খয়রু, ওয়াহুয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর' দু'আটির ফযীলত কী?

-নাজনীন পারভীন
আক্কেলপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত দু'আটি বাজারে প্রবেশের দু'আ হিসাবে বিভিন্ন হাদীছগ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে। এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের সময় এই দু‘আ পড়বে, তার জন্য হাজার হাজার নেকী লেখা হবে, হাজার হাজার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে’ (তিরমিযী, হা/৩৪২৯; ইবনু মাজাহ, হা/২২৩৫; মিশকাত, হা/২৪৩১)। অন্য বর্ণনায় আছে, ‘তার হাজার হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে’ (তিরমিযী, হা/৩৪২৮; মিশকাত, হা/২৪৩১)।

প্রশ্ন (২৭) : প্রচলিত রুকইয়া সেন্টারগুলোতে চিকিৎসা নেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
রাজশাহী।

উত্তর : ঝাড়ফুঁকের বৈধতার মূলনীতি হলো কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত সূরা-দু‘আর মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করতে হবে এবং শিরকী ও কুফরী কালাম থেকে মুক্ত হতে হবে। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ শারঈ ঝাড়ফুঁকের তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। ১. আল্লাহর নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে হতে হবে। ২. আরবী কিংবা যেকোনো বোধগম্য ভাষায় হতে হবে, যার অর্থ সুস্পষ্ট বুঝা যায়। ৩. এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ঝাড়ফুঁকের কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ চাইলে সুস্থ হবে, অন্যথা নয় (ফাতহুল বারী, ১০/১৯৫)। তাই রুকইয়া সেন্টারগুলো যদি উক্ত মূলনীতি ও শর্তসমূহ মেনে ঝাড়ফুঁক করে তাহলে সেখানে যেতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (২৮) : ছানা না পড়লে ছালাত হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
রানীরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : ছালাতের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া সুন্নাত। ছালাতে প্রত্যেকটি সুন্নাত গুরুত্বসহকারে আদায় করা জরুরী। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ছালাত শুরু করতেন তখনই ছানা পড়তেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছালাত শুরু করতেন তখন বলতেন, *‘সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা’*। অর্থ : আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনার প্রশংসা করছি। আপনার নাম বরকতময়। আপনার মর্যাদা সমুন্নত। আপনি ছাড়া কোনো প্রকৃত উপাস্য নাই (আবূ দাঊদ, হা/৭৭৬; নাসাঈ, হা/৮৯৯; মিশকাত, হা/৮১৫)।

উল্লেখ্য যে, ছানা পড়া যেহেতু সুন্নাত তাই কেউ যদি ছানা না পড়ে তাহলে তার ছালাত হয়ে যাবে তবে নেকী কম হবে।

প্রশ্ন (২৯) : কোনো সূরা, আয়াত বা দু‘আ বড় বড় অক্ষরে লিখে ও তা বাঁধাই করে ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা যাবে কি?

-হাসিনুর রহমান
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : না, এভাবে কোনো সূরা, আয়াত বা দু‘আ লিখে তা ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। কেননা তা ঝুলিয়ে রাখার ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের পক্ষ থেকে কোনো আমল পাওয়া যায় না। বরং এতে কুরআন-হাদীছের অবমাননার আশঙ্কা রয়েছে। কখনো তা পড়ে ভেঙে যায়, কখনো পায়ের নিচে পড়ে ইত্যাদি। আর যদি তা বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো বালা-মুছীবত হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তবে শিরক হবে। কেননা আল্লাহ যদি কাউকে কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা দূর করার কেউ নেই; আর যদি তিনি কারও কল্যাণ চান (তবে তিনি সেটাও করতে পারেন। কেননা,) তিনি প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান ও কর্তৃত্বশীল’ (আনআম, ৬/১৭)।

প্রশ্ন (৩০) : দিনে-রাতের যেকোনো সময়ে *‘সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি’* ১০০ বার করে পাঠ করা যাবে কি?

-সাব্বির
চিচিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : হ্যাঁ, দিনে-রাতে যেকোনো সময় ১০০ বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ বলা যাবে। এই মর্মে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দিনে ১০০ বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ পাঠ করবে আল্লাহ তার সকল (ছগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হয় (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪০৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯১)।

পারিবারিক বিধান--বিবাহ

প্রশ্ন (৩১) : বিয়ের এক বছর পর ওয়ালীমা করা যাবে কি?

-নাঈম ইসলাম
চৌমুহনি, বগুড়া।

উত্তর : ওয়ালীমা তিন দিনের মধ্যে হতে হবে; এটিই সুন্নাহ। তবে বিয়ের পরের দিন ওয়ালীমা করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করার পরদিন ওয়ালীমা করেছিলেন। আনাস ইবনু মালেক বলেন, ...রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নাব বিনতে জাহশের সাথে রাত কাটিয়ে সকাল করল। তিনি মদীনায় তাকে বিবাহ করেছিলেন। অতঃপর সকালে লোকদের খাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলেন... (ছহীহ বুখারী, হা/৫৪৬৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩৫০৩)।

প্রশ্ন (৩২) : বিবাহ অনুষ্ঠানে দাওয়াতের সাথে উপহার কামনা করা কি শরীআতসম্মত? এরূপ দাওয়াত গ্রহণ না করলে কি মুসলিমের হক্ব নষ্ট করা হবে?

-ইমামুল হক
মিশনপাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : হাদিয়ার বিষয়টি কোনো অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে নয়; বরং পরস্পর মহব্বত বাড়ানোর জন্য হাদিয়া দেওয়া যায়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিমের ওপর মুসলিমের ছয়টি হক্ব (অধিকার) আছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! এ অধিকারগুলো কী কী? জবাবে তিনি বলেন, (১) কোনো মুসলিমের সাথে দেখা হলে সালাম দেবে, (২) তোমাকে কেউ দাওয়াত দিলে তা কবুল করবে, (৩) তোমার কাছে কেউ কল্যাণ কামনা করলে তাকে কল্যাণের পরামর্শ দেবে, (৪) হাঁচি দিলে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে, (৫) কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখতে যাবে, (৬) কারো মৃত্যু ঘটলে তার জানাযায় শরীক হবে (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৬২; মিশকাত, হা/১৫২৫)। দাওয়াতের ব্যাপারটি মুসলিমদের পারস্পরিক হক্ব। তাই দাওয়াতকারীর উদ্দেশ্য যেটাই হোক না কেন সেখানে যাওয়াই উত্তম। তাছাড়া এর ফলে উপদেশ প্রদানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। ‘হাদিয়া’ বিনিময় পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি করে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমরা হাদিয়া বিনিময় করো ও মহব্বত বৃদ্ধি করো’ (ছহীহুল জামে‘, হা/৩০০৪)। সে হিসাবে কোনোরূপ শ্রুতি ও প্রদর্শনী ছাড়াই হাদিয়া দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন (৩৩) : মেয়ের বিয়েতে যৌতুক হিসাবে নয়; বরং ইচ্ছে করেই কিছু দিতে চাইলে জামাই তা গ্রহণ করতে পারে কি?

-আব্দুল্লাহ
ফুলবাড়িয়া, দিনাজপুর।

উত্তর : যৌতুকের নোংরা নীতিকে সমাজ থেকে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে বিবাহতে শ্বশুরের পক্ষ থেকে কোনোকিছু নিতে হবে না। কেননা মহান আল্লাহ স্ত্রীদেরকে মোহর প্রদানের আদেশ করেন। তিনি বলেন, ‘তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ করো এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও...’ (আন-নিসা, ৪/২৫)। আর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহতে স্ত্রীকে কিছু দিতে বলেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৩০; মিশকাত, হা/৩২০২)। তবে মেয়ের পিতা বিয়েতে স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে তা সময়ের গতিতে দিতে পারে। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমাকে তার সাথে বিবাহ দেন, তখন তিনি ফাতেমাকে একটা চাদর, একটা চামড়ার বালিশ যার ভেতরে সুগন্ধিযুক্ত ঘাস ছিল, দুইটি জাঁতা (ডাল বা চাল ভাঙার যন্ত্র বিশেষ), একটি পানি রাখার পাত্র ও দুইটি কলস দিয়েছিলেন (মুসনাদে আহমাদ, হা/৮১৯)। তবে চাপ প্রয়োগ করে বা দাবি করে কোনো কিছু নেওয়া হারাম, যা বর্তমানে অহরহ ঘটছে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল ভক্ষণ করো না...’ (আল-বাক্বারা, ২/১৮৮)।

প্রশ্ন (৩৪) : চাচি বা মামির বোনকে বিবাহ করা জায়েয কি?

-কাজী নাসিম
মীরসরাই, চট্টগ্রাম।

উত্তর : চাচি বা মামির বোন মাহরাম নয়। বিধায় তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোনো বাধা নেই। মহান আল্লাহ সূরা আন-নিসার মধ্যে মাহরামের তালিকা উল্লেখ করার পর বলেছেন, ‘এরা ছাড়া অন্যরা সবাই তোমাদের জন্য হালাল’ (আন-নিসা, ৪/২৪)। উল্লেখ্য যে, চাচি বা মামি স্থায়ী মাহরাম নয়। বরং চাচা বা মামা বেঁচে থাকা কিংবা তাদের থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ। চাচা বা মামা মারা গেলে কিংবা তাদের মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে ওই চাচি বা মামির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে শারঈ কোনো বাধা নেই। তবে খালা ও ফুফু স্থায়ী মাহরাম। অর্থাৎ তাদের সাথে কখনও বিবাহ জায়েয নয়।

প্রশ্ন (৩৫) : হাদীছে আছে, অলী ছাড়া বিবাহ বৈধ নয়। কিন্তু জনৈক মেয়ের পিতার অনুপস্থিতিতে ও অনুমতিক্রমে তার নানা/দাদা/চাচা/মামার কোনো একজন অলী হয়ে বিবাহ সম্পন্ন করেছে। উক্ত বিবাহ কি বৈধ হবে?

-আবূ হানীফ
সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : অলী বা অভিভাবক ছাড়া মেয়ের বিবাহ বৈধ নয়। তবে অলী দূরে থাকলে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে অন্যকে অভিভাবক নিযুক্ত করতে পারে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবীবা বিনতে আবী সুফিয়ানকে বিবাহ করার সময় আমর ইবনু উমাইয়া যমরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে বাদশা নাজাশীর কাছে পাঠিয়েছিলেন (সুনানে কুবরা, বায়হাক্বী, হা/১৪১৬৯)। তাই উক্ত বিবাহ শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক হয়েছে।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৩৬) : যুবতী কন্যা পিতা-মাতার নিষেধ সত্ত্বেও জনৈক যুবকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এমতাবস্থায় ঐ কন্যাকে বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পদ অন্য সন্তানদেরকে দিয়ে দিলে পিতা-মাতার কি কোনো পাপ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : এমতাবস্থায় বিবাহ বাতিল। কেননা অলী ছাড়া মেয়ের বিবাহ হয় না (তিরমিযী, হা/১১০১; আবূ দাঊদ, হা/২০৮৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮১, আহমাদ, হা/১৯৭৪৬; মিশকাত, হা/৩১৩০)। তবে, পিতা-মাতার সম্পদের অধিকার যেমন ছেলের রয়েছে ঠিক তদ্রূপ মেয়েরও রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করছেন, একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর সমান' (আন-নিসা, ৪/১১)। পিতা-মাতার সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কিছু কারণ রয়েছে সে সকল কারণ পাওয়া না গেলে পিতা-মাতা সন্তানকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। ১. অন্যায়ভাবে যার সম্পদের হক্ব পাবে তাকে হত্যা করা (আবূ দাঊদ, হা/৪৫৬৪; মিশকাত, হা/৩৫০০)। ২. ধর্মের ভিন্নতা অর্থাৎ কেউ যদি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় (ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৬৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬১৪)। ৩. দাসত্ব (আন-নাহল, ১৬/৭৫)। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত পরিস্থিতিতে কন্যা সন্তান অবশ্যই পিতা-মাতার সম্পদের হক্বদার। যদি পিতা-মাতা তাকে সম্পদ না দিয়ে বঞ্চিত করে তাহলে তারা পাপী হবে।

প্রশ্ন (৩৭) : ঘটকালিকে ব্যাবসা হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ হবে কি?

-আসাদুল্লাহ
তালা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ঘটকালি করা বৈধ। কারণ এতে মানুষের উপকার ও সহযোগিতা করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ভালো কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো' (আল-মায়েদা, ৫/২)। কাজেই এটা ব্যাবসা হিসাবে গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই। তবে এতে কোনো মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যাবে না এবং কোনো পক্ষের দোষ গোপন করা যাবে না। এমনকি তাতে কোনো প্রকার ধোঁকার আশ্রয়ও নেওয়া যাবে না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়, আর যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দিবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১; মিশকাত, হা/৩৫২০)। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহের বর-কনের ভালো-মন্দ অবগত হতে বলেছেন (তিরমিযী, হা/১০৮৭; ইবনু মাজাহ, হা/৮৬৬৫, আহমাদ, হা/১৮১৫৪; মিশকাত, হা/৩১০৭, 'বিবাহ' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (৩৮) : মেয়ে তার পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। পরবর্তীতে মেয়ের মা উক্ত বিবাহ মেনে নিয়েছে। কিন্তু বাবা মেনে নেয়নি? এমতাবস্থায় উক্ত বিবাহ বৈধ হবে কি?

-শারমিন সুলতানা
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : মেয়ের মা উক্ত বিবাহের স্বীকৃতি প্রদান করুক আর না করুক বিবাহ শরীআতসম্মত হবে না। কারণ মেয়ের মা অভিভাবক হতে পারে না। বরং পিতাই তার মূল অভিভাবক। আবূ মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না (তিরমিযী, হা/১১০১; আবূ দাঊদ, হা/২০৮৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮১, আহমাদ, হা/১৯৭৪৬; মিশকাত, হা/৩১৩০)। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোনো নারী অন্য কোনো নারীকে বিবাহ দিতে পারে না এবং কোনো নারী নিজেও বিবাহ করতে পারে না। যে নারী নিজে বিবাহ করে সে ব্যভিচারিণী' (ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮২; মিশকাত, হা/৩১৩৭)।

পারিবারিক বিধান—তালাক

প্রশ্ন (৩৯) : এক মাসের মধ্যে পর্যায়ক্রমে তিন তালাক দিলে তা গণ্য হবে কি? এর পক্ষে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রদত্ত বিধান কি ধর্তব্য?

-নাজনীন পারভিন
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : এক সাথে বা এক পবিত্রতায় তিন তালাক দিলে তা এক তালাক হিসাবেই গণ্য হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ রুকানা যখন তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নাও। সে বলল, আমি তাকে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তা জানি, তুমি তাকে ফিরিয়ে নাও' (আবূ দাঊদ, হা/২১৯৬)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবূ রুকানা যখন তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দেন, তখন সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীকে তার কাছে ফেরত দেন এবং বলেন, এটি এক তালাক হিসেবে গণ্য (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৮৭)। উল্লেখ্য যে, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলে মানুষের তাড়াহুড়ার কারণে তিনি একসাথে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক হিসাবে গণ্য করেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৭২)। এটা ছিল

তাঁর সাময়িকভাবে প্রশাসনিক ফরমান ও ইজতিহাদ। তবে তিনি এই ফতওয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন (ইগাছাতুল লাহফান, ১/৩৩৬)। অতএব আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে।

প্রশ্ন (৪০) : তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে মোবাইলে বা সরাসরি কথা বলা যাবে কি?

-ফয়সাল

চাঁদমারী, পাবনা।

উত্তর : বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে মোবাইলে কথোপকথন বা সরাসরি আলাপ করা যাবে না (আন-নূর, ৪/৩০)। কারণ সে অন্যান্য সাধারণ মহিলার মতো গায়রে মাহরাম।

মসজিদ-মুছল্লা

প্রশ্ন (৪১) : আমাদের গ্রামে অনেক পুরাতন একটি মসজিদ আছে। যার অবস্থা অনেক জরাজীর্ণ। এমতাবস্থায় আমরা অন্য একটি স্থানে নতুন একটি মসজিদ তৈরির পরিকল্পনা করছি। এখন পুরাতন ঐ মসজিদের স্থানে কি কোনোকিছু করা যাবে, না-কি স্থানটিকে ফাঁকা রাখতে হবে?

-পারভেজ মোশারফ

বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : শারঈ কারণবশত মসজিদ স্থানান্তর করলে পূর্বের জায়গা বিক্রি করা যাবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ নতুন মসজিদে ব্যয় করা যাবে। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর যুগে কূফার দায়িত্বশীল ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)। একদা মসজিদ হতে বায়তুল মাল চুরি হলে সে ঘটনা উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে জানানো হয়। তখন তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তর করা হয় এবং পূর্বের স্থানটি খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় (ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়্যা, ৩১/২১৭)। একদা ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যদি মসজিদে স্থান সংকুলান না হয় এবং স্থানটি সংকীর্ণ হওয়ার কারণে তার চাইতে প্রশস্ত স্থানে মসজিদ স্থানান্তর করা হয়, অথবা মসজিদটি জীর্ণ ও বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ঐ মসজিদ ও তার মাটি বিক্রি করে অন্যত্র নতুন মসজিদ প্রতিষ্ঠায় তা ব্যয় করতে হবে, যা আগের চাইতে অধিক কল্যাণকর হয়। এমতাবস্থায় বিক্রীত জমিতে যেকোনো বৈধ স্থাপনা করা যাবে (ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়্যা, ৩১/২১৬, ২২৪, ২২৭, ২৩৩)।

প্রশ্ন (৪২) : ছালাতের ওয়াক্তের আগে বা পরে মসজিদ প্রাঙ্গনে ও মসজিদের বারান্দায় অস্থায়ী দোকান বসিয়ে কেনাবেচা করা কি বৈধ?

-শাইখ মাহমুদ

গাজীপুর সদর।

উত্তর : মসজিদের বারান্দা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই মসজিদের ভেতরে ও বারান্দায় ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। কেননা মসজিদের বারান্দায় ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যখন তোমরা কাউকে মসজিদে কেনাবেচা করতে দেখবে তখন তোমরা বলো, আল্লাহ তোমার ব্যাবসায় লাভবান না করুক...' (তিরমিযী, হা/১৩১২; ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৯১; মিশকাত, হা/৭৩৩)। তবে মসজিদের ডানে-বামে ও সামনে ক্রয়-বিক্রয়ে সমস্যা নেই। কেননা তা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

বিদআত-মীলাদ

প্রশ্ন (৪৩) : কোনো গরীব-অসহায় ব্যক্তি যদি মীলাদ করার জন্য সাহায্য চায় তাহলে কি তাকে সহযোগিতা করা যাবে?

-নাজনীন পারভিন

আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : মীলাদ একটি বিদআতী প্রথা, যা গুনাহের মাধ্যম। এই মীলাদ বা বিদআতী কাজে কাউকে সাহায্য করা যাবে না। সে যেই হোক না কেন। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোরমা পরস্পর তাক্বওয়া ও নেকীর কাজে সহযোগিতা করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বিদআতীকে আশ্রয় দেয় আল্লাহ তার প্রতি লা'নত করেছেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৯৮; মিশকাত, হা/৪০৭০)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৪৪) : হাঁস-মুরগির গিলা ও গরু-ছাগলের ভুঁড়ি খাওয়া কি ঠিক?

-আবু হানীফ

সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : ইবাদতের আসল হলো দলীল। যেকোনো ইবাদত করতে হলে দলীলের ভিত্তিতে করতে হবে। দলীল না থাকলে সেই ইবাদত বিদআত বলে গণ্য হবে। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার পক্ষে আমাদের কোনো নির্দেশনা

www.al-itisam.com

নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮; ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭)। অপরদিকে খাদ্য-দ্রব্যের আসল হলো হালাল। হারামের দলীল না পাওয়া পর্যন্ত সব খাদ্যই হালাল। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যা কিছু তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন' (আল-আনআম, ৬/১১৯)। যেহেতু হাঁস-মুরগির গিলা, গরু-ছাগলের নাড়ি-ভুঁড়ি হারাম হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই, তাই প্রাণী হিসাবে সেগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে খাওয়া হালাল। যার রুচি হবে সে খাবে।

কিছছা-কাহিনী

প্রশ্ন (৪৫) : মূসা আলাইহিস সালাম-এর হাতের লাঠিটি ছিল আদম আলাইহিস সালাম-এর। তিনি জান্নাত থেকে আসার সময় জান্নাতের গাছের একটি ডাল নিয়ে এসেছিলেন। ডালটি আদম আলাইহিস সালাম লাঠিরূপে ব্যবহার করেছিলেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নবীগণের হাতে আসতে থাকে। শেষে মূসা আলাইহিস সালাম-এর নিকট এসে পৌঁছে। এ লাঠির অনেক মু'জিযা ছিল। উক্ত ঘটনা কি সত্য?

-আব্দুর রহমান
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : উক্ত ঘটনার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিচার-ফায়সালা/আইন-আদালত

প্রশ্ন (৪৬) : জনৈক মুসলিম ব্যক্তি ইয়াহূদীর সাথে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যায়। তিনি ইয়াহূদীর পক্ষে ফায়সালা দেন। মুসলিম ব্যক্তি রাসূলের ফায়সালা উপেক্ষা করে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গেলে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করেন। উক্ত ঘটনা কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ
জয়দেপপুর, গাজীপুর।

উত্তর : প্রকৃত ঘটনা এই যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফাতো ভাই যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং বদরী ছাহাবী হাতেব ইবনু আবূ বালতাআহ আনছারীর মধ্যে নালা থেকে ক্ষেতে পানি দেওয়া নিয়ে ঝগড়া হয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে রায় দেন। কেননা তার জমি ছিল উঁচুতে এবং বিবাদীর জমিটি ছিল নিচুতে। তাই উপরের ক্ষেতে পানি না দিয়ে নিচের ক্ষেতে আগে পানি চালু করা সম্ভব ছিল না। তাতে বিবাদী নাখোশ হয়ে বলেন যে, যুবায়ের আপনার ফুফাতো ভাই হওয়ার কারণে আপনি তার পক্ষে রায় দিলেন। এতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা লাল হয়ে যায়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা আন-নিসার ৬৫ নং আয়াতটি নাযিল হয় (ছহীহ বুখারী, হা/৪৫৮৫ ও অন্যান্য, তাফসীর ইবনু কাছীর)। প্রশ্নে উল্লেখিত উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘটনাটি এবং এর কারণে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে 'ফারূক' উপাধি দেওয়া হয় বলে কালবী সূত্রে আবূ ছালেহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে বর্ণনা এসেছে, যা যঈফ এবং গারীব (غريب)। কালবী 'মিথ্যুক' বলে অভিযুক্ত (তাহক্বীক্ব কুরতুবী, হা/২২৯৮ ও ২২৯৯-এর টীকা দ্র.; ইবনু কাছীর একে 'অতীব বিস্ময়কর' বলেছেন)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৭) : আমি ইন্টারনেট থেকে একটি বইয়ের পিডিএফ সংগ্রহ করে পড়েছি। কিন্তু জানি না, বইটির পিডিএফ অনুমোদিত কি-না। অথবা যিনি বইটির পিডিএফ বানিয়ে নেটে ছেড়েছেন, তিনি প্রকাশনীর কাছে অনুমতি নিয়েছেন কি-না? এমতাবস্থায় বইটি পড়া আমার জন্য জায়েয হবে?

-আমীনুল ইসলাম জিহান
শেরপুর, ময়মনসিংহ।

উত্তর : বই-পুস্তক লেখা বা ছাপানো হয় মূলত দু'টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। ১. জ্ঞান প্রচারের সাথে সাথে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করার জন্য। এবং ২. জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে ফ্রি বিতরণের জন্য। সুতরাং শুধুমাত্র জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত বই-পুস্তক ডাউনলোড করাতে কোনো বাধা নেই। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রকাশিত যে সকল বই-পুস্তকের পিডিএফ কপি ইন্টারনেট থেকে ফ্রি- ডাউনলোড করা যায় সে সকল বই-পুস্তক দুইভাবে আপলোড করা থাকে। ১. লেখক বা প্রকাশক কর্তৃক অনুমোদিত ২. অনুমোদিত নয়। যদি অনুমোদিত হয়ে থাকে তাহলে তা ডাউনলোড করে পড়াতে কোনো সমস্যা নেই। আর অনুমোদিত না হলেও তা জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ডাউনলোড করে পড়া যায়। তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ডাউনলোড করে ছাপিয়ে বিক্রয় করা যাবে না। মূলত লেখক সত্ত্ব দ্বারা লেখক যে অধিকার সংরক্ষণ করেন তা হলো 'বই লেখক বা প্রকাশনীর অনুমোদন ব্যতীত বাজারে বিক্রয় করার'। সুতরাং পিডিএফ বই ডাউনলোড করে পড়া যাবে। তবে তা ছাপিয়ে বিক্রয় করা যাবে না। (লিক্বাউল বাবিল মাফতুহ, 'ছালেহ আল উছায়মীন' খণ্ড ১৯; ১৭৮ পৃ. ছামারাতুত তাদবীন 'লিল উছায়মীন' ১৪২ পৃ.)। তবে রাষ্ট্রীয় আইনে যদি লেখকের বিনা অনুমতিতে পিডিএফ বানানো অপরাধ হয় তাহলে শারয়ী দৃষ্টিতেও তা অপরাধ বলে গণ্য হবে। কারণ বিনা অনুমতিতে কারও আসনে পর্যন্ত বসা জায়েয নয় (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭৩; মিশকাত, হা/১১১৭)। কারও সম্পদ ভোগ করা তো বহু দূরের কথা।

প্রশ্ন (৪৮) : আমি অনেকবার বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণ করেছি। এখন বুঝতে পেরেছি এতে রাষ্ট্রের হক্ব নষ্ট হয়েছে। এখন কীভাবে তা আদায় করব?

-সোহেল রানা
নীলফামারী।

উত্তর : বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণ করা বৈধ হবে না। কেননা ট্রেনের নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ না করে ট্রেন ভ্রমণ করা স্পষ্ট ফাঁকিবাজি, ধোঁকাবাজি ও আমানতের খিয়ানত, যা স্পষ্ট হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমানত তার হক্বদারের নিকট প্রত্যর্পণ করতে। আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কতই না উৎকৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা' (আন-নিসা, ৪/৫৮)। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দিবে সে আমাদের দলভুক্ত নয় (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১; মিশকাত, ৩৫২০)। এমতাবস্থায় সরকারের খাতে জমা হবে এমন নিশ্চয়তা থাকলে ফিরিয়ে দিবে। অন্যথা আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্তির আশায় দান করে দিয়ে তওবা করতে হবে।

প্রশ্ন (৪৯) : শিক্ষার্থীদের শাসন করার ব্যাপারে শিক্ষকের অধিকার কতটুকু?

-আবু সাঈদ
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার্থীর প্রতি সদয় ও কোমল আচরণ করবেন এটাই ইসলামের নীতি। যা ইসলামের মহান শিক্ষক নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ থেকে প্রমাণিত হয়। মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে ছালাত আদায় করেছিলাম। ইত্যবসরে আমাদের মধ্যে একজন হাঁচি দিল। আমি ইয়ারহামুকাল্লহ বললাম। তখন লোকেরা আমার দিকে আড় চোখে দেখতে লাগল। আমি বললাম, আমার মায়ের পুত্র বিয়োগ হোক। তোমরা আমার প্রতি তাকাচ্ছ কেন? তখন তারা তাদের উরুর উপর হাত চাপড়াতে লাগল। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে, তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছালাত শেষ করলেন, আমার মাতা-পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক! আমি তার মতো এত সুন্দর করে শিক্ষা দিতে পূর্বেও কাউকে দেখিনি, তারপরও কাউকে দেখিনি। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে ধমক দিলেন না, মারলেন না, গালিও দিলেন না। বরং বললেন, ছালাতে কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। বরং তা হচ্ছে- তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের জন্য' (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩৭; মিশকাত, হা/৯৭৮)। তবে আদরে কাজ না হলে হালকা প্রহার করা যায়। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদবের লাঠি উঠিয়ে নিতে নিষেধ করেছেন ও বলেছেন, 'তুমি তোমার পরিবারের উপর হতে শিষ্টাচারের লাঠি উঠিয়ে নিয়ো না' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১২৮; মিশকাত, হা/৬১)।

প্রশ্ন (৫০) : জালেমের জন্য মাজলূমের করণীয় কী?

-যুবাইর আলম
মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা।

উত্তর : জুলুম কিয়ামতের দিন জালেমের জন্য অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে। তাই জুলুম থেকে বেঁচে থাকা সকলের জন্য জরুরী। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমার ভাইকে সাহায্য করো। হোক সে জালেম অথবা মাজলূম। ছাহাবীগণ বললেন, মাজলূমকে সাহায্য করলাম, সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু জালেমকে কীভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখো' (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৪; মিশকাত, হা/৪৯৫৭)। দ্বিতীয়ত, তার সাথে গন্ডগোল পরিহার করার চেষ্টা করা। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সঠিক হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করল, তার জন্য জান্নাতের এক পার্শ্বে একটি বালাখানা নির্মাণ করা হয়' (আবূ দাঊদ, হা/৪৮০০; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৭৩)। তৃতীয়ত, তার হেদায়াতের জন্য দু'আ করা। চতুর্থত, তার জন্য বদদু'আ না করা। কেননা তার দু'আ ও আল্লাহর মাঝে কোনো আড়াল থাকে না (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৯৬)।

মাসিক আল-ইতিছামে প্রশ্ন জমাদানের জন্য যোগাযোগ করুন

মোবাইল : ০১৭০৯-৭৯৬৪৩৮
ওয়েব : al-itisam.com

ডাক যোগাযোগ : সম্পাদক, মাসিক আল-ইতিছাম আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী; তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন:

আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, দিনাজপুর)

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Jamiah As Salafiya General Fund
Account No: 20501130204367701

Account Name: Al Jamiah As Salafiya Zakat Fund
Account No: 20501130204367417

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রম

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ- ঢাকা, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গাইবান্ধা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund
Account No: 20501130204367316

দাওয়াহ কার্যক্রম

মাসিক আল-ইতিছাম, আল-ইতিছাম টিভি, আল-ইতিছাম গবেষণাগার, আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, দাঈ নিয়োগ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Itisam Dawah Fund
Account No: 20501130204367802

ত্রাণ কার্যক্রম

দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলে ত্রাণ সহায়তা ও শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Tran Tahbil Fund
Account No: 20501130204367903

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রম

দুস্থ, ইয়াতীম শিক্ষার্থী প্রতিপালন।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Yatim Kollan Fund
Account No: 20501130204367600

বিকাশ এজেন্ট : ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ | বিকাশ পার্সোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ ; ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ ; ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ | রকেট পার্সোনাল : ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ ; ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮-৭

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

Monthly Al-Itisam الإعتصام 5th Year, 10th Part, August 2021, Price : 25.00

নিবরাস প্রকাশনী কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বইসমূহ

আদর্শ পরিবার
লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৫৬ | মূল্য : ১৫০ টাকা

মরণ একদিন আসবেই
লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৮৮ | মূল্য : ১৫০ টাকা

কে বড় লাভবান
লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৬০ | মূল্য : ১৫০ টাকা

রিযিক্ব
লেখক : আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
পৃষ্ঠা : ৯৬ | মূল্য : ৭০ টাকা

তাফসির কি মিথ্যা হতে পারে?
লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ১৯৬ | মূল্য : ১০০ টাকা

কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত
লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৮০ | মূল্য : ১৫টাকা

যোগাযোগ : নিবরাস প্রকাশনী

রাজশাহী শাখা : এমাদ আলী প্লাজা, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী। মোবা : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬
বাংলাবাজার শাখা : গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৪০৭-০২১৮৫০

আলহামদুলিল্লাহ!

ঢাকা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া ও বগুড়া জেলায় ফ্রি অক্সিজেন

ইনশাআল্লাহ! আদ-দাওয়া ইলাল্লহ-এর স্বেচ্ছাসেবকগণ দ্রুততম সময়ে অক্সিজেন নিয়ে পৌঁছে যাবে আপনার দরজায়।

ঢাকা ০১৪০৭০২১৮৫০
রাজশাহী ০১৪০৭০২১৮১৫
কুষ্টিয়া ০১৭১১৭০৮৯১৯
বগুড়া ০১৭৩১১৮৩১১৪

সার্বিক সহযোগিতা:
০১৮৩৫৯৮৪৬৪৮
নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন।
বাস্তবায়নে: আদ-দাওয়া ইলাল্লহ,
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

الإعتصام Al-Itisam TV

কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার লক্ষ্যে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর অফিসিয়াল মিডিয়া আল-ইতিছাম টিভি। শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ সহ অন্যান্য আলোচকদের কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক নিয়মিত দারস পেতে আল-ইতিছাম টিভি সাবস্ক্রাইব করুন!

www.facebook.com/alitisamtv
www.youtube.com/c/alitisamtv